এস, মানুষ হও

নিবেদন

"এস, মানুষ হও" পুস্তকটি স্বামী বিবেকানন্দের "পত্রাবলী" ও "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ" থেকে সঙ্কলিত এবং উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত। সঙ্কলন করেছেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ। ঢাকা সংস্করণ নামে পুনর্মুদ্রিত হল এটি। এ সঙ্কলন থেকে বাংলাদেশের বিবেকানন্দ-অনুরাগিবৃন্দ সহজেই স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক চিন্তাধারার সাথে পরিচিতি হবেন—এ আমাদের আশা।

ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কোন মৌলিক সমস্যার সমাধানে প্রথমে চাই খাঁটি 'মানুষ'। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান— "এস, মানুষ হও"। প্রাচ্য ও পাশ্চত্য ভাবধারার কল্যাণকর ও জীবনপ্রদ দিকটি তুলে ধরে স্বামীজির এ আহ্বান। বাংলাদেশের মানুষ এ তেজোদ্দীপ্ত আহ্বানে মানবকল্যাণে অনুপ্রাণিত হবেন—এ আমাদের বিশ্বাস। এ পুস্তকটি ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ থেকে প্রকাশ করতে পারায় উদ্বোধন কার্যালয়ের প্রকাশককে জানাই আমাদের ধন্যবাদ।

৭ ফাল্গুন, ১৪০২
২০ ফেব্রুআরি ১৯৯৬

প্রকাশক

প্রচ্ছদ-ভাবনা

"পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য ওঠার আর বিলম্ব নেই। তোরা এই সময়ে কোমর বেঁধে লেগে যা...। তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে-দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি করে বসে থাকলে চলবে না। শিক্ষাহীন, ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে, ভাই সব, ওঠ, জাগো। কতদিন আর ঘুমুবে?" যুবসমাজের প্রতি এ অগ্নিময় আহ্বান নিয়ে তৎকালীন ভারতবর্ষের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে বিরামহীনভাবে ঘুরেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভক্ত এবং অনুরাগীদের আহ্বানে এসেছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশেও। বক্তৃতা দিয়েছিলেন বর্তমান পুরনো ঢাকার পগোজ স্কুলে এবং জগন্নাথ কলেজ মাঠে। অবস্থান করেছিলেন ফরাশগঞ্জ নিবাসী জমিদার মোহিনীমোহন দাসের বাড়ীতে (পেছনের প্রচ্ছদ)। স্বামীজীর পাদস্পর্শে ধন্য সেই বাড়ীটি বর্তমানে বিলুপ্ত।

সূচীপত্র

এস, মানুষ হও

জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথা উদিত হচ্ছে, তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ করে বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখনও সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ।

আর তোমরা কি করছ? সারা জীবন কেবল বাজে বকছ। এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও—গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে! তোমরা—দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়!! এই হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ! পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কী বলো দেখি? আর তোমরা এখন করছই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছ! ইওরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০.০০ টাকার কেরানিগিরির দিকে পড়ে রয়েছে; না হয় খুবজোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছ। এহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশেপাশে একপাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—'বাবা, খাবার দাও, খাবার দাও' করে উচ্চ চিৎকার তুলেছে!! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে না?

এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনও শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ের কখনও প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব; আগে তাদের নির্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার

জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই বাঁধাধরা সভ্যতা ভাঙবার জন্য ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে প্রেরণ করেছেন, আর মাদ্রাজের লোকই ইংরেজদের ভারতে বসবার প্রধান সহায় হয়। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মাদ্রাজ এমন কতগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে?

ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে। খবরের কাগজে হুজুক করা নয়। সর্বদা মনে রাখবে, নামযশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

একটা আদর্শকে ধর, ঝাঁপিয়ে পড়, জীবন উৎসর্গ কর

মেরী তুমি হলে একটি তেজী আরবী ঘোড়ার মতো—মহীয়সী ও দীপ্তিময়ী। তোমাকে রানী হিসেবে চমৎকার মানাবে—দেহে ও মেজাজে। তুমি একজন তেজস্বী, বীর, দুঃসাহসী, নির্ভীক স্বামীর পাশে উজ্জ্বল দীপ্তিতে শোভা পাবে; কিন্তু স্নেহের ভগিনি, গৃহিণী হিসাবে তুমি হবে একেবারেই নিকৃষ্ট। তুমি আমাদের দৈনন্দিন জগতের স্বচ্ছন্দচারী, সাংসারিক, পরিশ্রমী অথচ ঢিলেঢালা স্বামী বেচারাদের জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলবে। ভগিনি, মনে রেখো যদিও এ-কথা সত্যি যে বাস্তব জীবন উপন্যাসের চেয়ে বেশী রোমাঞ্চকর, কিন্তু সে-রকম ঘটে কৃচিৎ কখনো। তাই তোমার প্রতি আমার উপদেশ—যতদিন না তোমার আদর্শকে বাস্তব ভূমিতে নামিয়ে আনতে পারছ, ততদিন তোমার বিয়ে করা ঠিক হবে না। যদি কর, তবে তা তোমাদের উভয়ের অশান্তি ডেকে আনবে। কয়েক মাসের মধ্যেই তুমি একজন সাধারণ ভালমানুষ মার্জিতরুচি যুবাপুরুষের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে, তখন তোমার কাছে জীবন নীরস বলে বোধ হবে। ভগিনী ইসাবেল-এর মেজাজটাও তোমারই মতন, শুধু কিণ্ডারগার্টেনটি তাকে বেশ কিছুটা ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দিয়েছে। সম্ভবতঃ সে ভাল গৃহিণীই হতে পারবে।

জগতে দু রকমের লোক আছে। একরকম হলো—বলিষ্ঠ, শান্তিপ্রিয়, প্রকৃতির কাছে নতি স্বীকার করে, বেশী কল্পনার ধার ধারে না, কিন্তু সৎ সহৃদয় মধুরস্বভাব ইত্যাদি। তাদেরই জন্য এই পৃথিবী; তারাই সুখী হতে জন্মেছে। আবার অন্য রকমের লোক আছে, যাদের স্নায়ুগুলি উত্তেজনাপ্রবণ, যারা ভয়ানক রকম কল্পনাপ্রিয়, তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন, এবং সর্বদা এই মুহূর্তে উঁচুতে উঠছে এবং পরের মুহূর্তে তলিয়ে যাচ্ছে। তাদের বরাতে সুখ নেই। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা মাঝামাঝি একটা সুখের সুরে ভেসে যায়। শেষোক্তেরা আনন্দ ও বেদনার মধ্যে ছুটোছুটি করে। কিন্তু এরাই হলো প্রতিভার উপাদান। 'প্রতিভা এক রকমের পাগলামি'—আধুনিক এই মতবাদের মধ্যে অন্ততঃ কিছু সত্য নিহিত আছে।

এখন এই শ্রেণীর লোকেরা যদি বড় হতে চায়, তবে তাদের তা চরিতার্থ করবার জন্য লড়াই করতে হবে—লড়াই-এর জন্যেই, আর বাইরে বেরিয়ে এসে। তাদের কোন দায় থাকবে না—বিবাহ নয়, সন্তান নয়, সেই এক চিন্তা ছাড়া আর কোন অনাবশ্যক আসক্তি নয়; সেই আদর্শের জন্যই জীবনধারণ এবং সেই আদর্শের জন্যই মৃত্যুবরণ। আমি এই শ্রেণীর মানুষ। আমার একমাত্র ভাবাদর্শ হলো 'বেদান্ত' এবং আমি 'লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত'। তুমি ও ইসাবেল এই ধাতুতে গড়া; কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যদিও কথাটা রূঢ়, তোমরা তোমাদের জীবনের বৃথাই অপচয় করছ। হয় একটা আদর্শকে ধর, বাইরে ঝাঁপিয়ে পড় এবং তার জন্য জীবন উৎসর্গ কর; কিংবা অল্পে সন্তুষ্ট থাকো ও বাস্তববাদী হও; আদর্শকে খাটো করে বিয়ে কর ও সুখের জীবন যাপন কর। হয় 'ভোগ' নয় 'যোগ'—হয় এই জীবনটাকে উপভোগ কর, অথবা সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে যোগী হও; দুটি একসঙ্গে লাভ করার সাধ্য কারও নেই। এইবেলা না হলে কোনকালেই হবে না, ঝটপট একটাকে বেছে নাও। কথায় বলে, 'যে খুব বাছবিচার করে, তার বরাতে কিছুই জোটে না'। তাই আন্তরিকভাবে, খাঁটিভাবে আমরণ সঙ্কল্প নিয়ে 'লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হও'; দর্শন বা বিজ্ঞান, ধর্ম বা সাহিত্য—যে-কোন একটিকে অবলম্বন কর এবং অবশিষ্ট জীবনে সেইটিই তোমার উপাস্য দেবতা হোক। হয় সুখী হও, নয়তো মহৎ হও। তোমার ও ইসাবেলের প্রতি আমার এতটুকু সহানুভূতি নেই; তোমরা না এটায় না ওটায়। তোমরাও হ্যারিয়েটের মতো ঠিক পথটি বেছে নিয়ে সুখী হও, কিংবা মহীয়সী হও—এই আমি দেখতে চাই। পান ভোজন সজ্জা ও যত বাজে সামাজিক চালচলনের ছেলেমানুষির জন্য একটা জীবন দেওয়া চলে না—বিশেষতঃ মেরী,

তোমার। অদ্ভুত মস্তিষ্ক ও কর্মকুশলতাকে তুমি মরচে পড়তে দিয়ে নষ্ট করে ফেলছ, যার কোন অজুহাত নেই। বড় হবার উচ্চাশা তোমাকে রাখতে হবে।

তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ

কাল নারী-কারাগারের অধ্যক্ষা মিসেস জন্‌সন্ এখানে আসিয়াছিলেন; এখানে কারাগার বলে না, বলে—সংশোধনাগার। আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অতি অদ্ভুত জিনিস। কারাবাসিগণের সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তাহারা ফিরিয়া গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়! কি অদ্ভুত, কি সুন্দর! না দেখিলে তোমাদের বিশ্বাস হইবে না। ইহা দেখিয়া তারপর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই, পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই! ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না—কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দুধর্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তর ধর্মের নাশই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়। শোন বন্ধু, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম তো শিখাইতেছেন—জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহু রূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। প্রভু তোমাদের নিকট বুদ্ধরূপে আসিয়া শিখাইলেন তোমাদিগকে গরীবের জন্য, দুঃখীর জন্য, পাপীর জন্য প্রাণ কাঁদাইতে, তাহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে; কিন্তু তোমরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলে না।

লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধুক এবং মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক।

হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক'[১] নামক মত দ্বারা সর্বপ্রকার অত্যাচারের আসুরিক যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।

নিরাশ হইও না। স্মরণ রাখিও, ভগবান গীতায় বলিতেছেন, 'কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়'। কোমর বাঁধো, বৎস, প্রভু আমাকে এই কাজের জন্য ডাকিয়াছেন। সারা জীবন আমার নানা দুঃখযন্ত্রণার মধ্যেই কাটিয়াছে। আমি প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে একরূপ অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি। লোকে আমাকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে, জুয়াচোর, বদমাশ বলিয়াছে। আমি এ সমস্তই সহ্য করিয়াছি তাহাদেরই জন্য, যাহারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করিয়াছে। বৎস! এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলেও একটু কম্পিত হয় না। যাহারা আমাকে ভণ্ড বিবেচনা করে, তাহাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। তাহাদের কিছু দোষ নাই। তাহারা শিশু, অতি শিশু, যদিও সমাজে তাহারা মহাগণ্যমান্য বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের চক্ষু নিজেদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিসীমার বাহিরে আর কিছু দেখিতে পায় না। তাহাদের নিয়মিত কার্য—আহার, পান, অর্থোপার্জন ও বংশবৃদ্ধি—যেন গণিতের নিয়মে অতি সুশৃঙ্খলভাবে পর পর সম্পাদিত হইয়া চলিয়াছে। ইহার অতিরিক্ত আর কিছু তাহারা জানে না। বেশ সুখী তাহারা! তাহাদের ঘুমের

---

১ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক : যখন লোককে বলা যায়, 'তোমাদের শাস্ত্রে আছে, সকলের ভিতরে এক আত্মা আছেন, সুতরাং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া এবং কাহাকেও ঘৃণা না করা শাস্ত্রের আদেশ', লোকে তখন এইভাব কার্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াই উত্তর দেয়, 'পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক'। এই ভেদদৃষ্টি দূর করিবার চেষ্টা না করাতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত দ্বেষ-হিংসা রহিয়াছে।

ব্যাঘাত কিছুতেই হয় না। শত শত শতাব্দীর পাশব অত্যাচারের ফলে সমুত্থিত শোক, তাপ, দৈন্য ও পাপের যে কাতরধ্বনিতে ভারতাকাশ সমাকুল হইয়াছে, তাহাতেও তাহাদের জীবন সম্বন্ধে দিবাস্বপ্নের ব্যাঘাত হয় না। সেই শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা নারীকে সন্তান ধারণ করিবার দাসীস্বরূপা করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, এ কথা তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদিত হয় না। কিন্তু অন্যান্য অনেকে আছেন, যাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছেন, হৃদয়ের রক্তময় অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন; যাঁহারা মনে করেন, ইহার প্রতিকার আছে, আর প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া যাঁহারা ইহার প্রতিকারে প্রস্তুত আছেন। 'ইহাদিগকে লইয়াই স্বর্গরাজ্য বিরচিত।' ইহা কি স্বাভাবিক নহে যে, উচ্চস্তরে অবস্থিত এই সকল মহাপুরুষের—ঐ বিষোদ্গিরণকারী ঘৃণ্য কীটগণের প্রলাপবাক্য শুনিবার মোটেই অবকাশ নাই?

গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নাই—তাহারা একরূপ মৃতকল্প বলিলেই হয়। ভরসা তোমাদের উপর—পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখো। কোন চালাকির প্রয়োজন নাই; চালাকি দ্বারা কিছুই হয় না। দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথাকথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আর আমার স্বদেশের লোকেরাই যখন আমায় জুয়াচোর ভাবে, তখন আমেরিকানরা এক অপরিচিত বিদেশী ভিক্ষুককে অর্থ ভিক্ষা করিতে দেখিলে কত কীই না ভাবিবে? কিন্তু ভগবান অনন্তশক্তিমান; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু হে যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা—দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে—যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ-

অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহা বলি প্রদান কর; বলি—জীবন-বলি তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

এ এক দিনের কাজ নয়। পথ ভীষণ কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থসারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত, তাহা আমরা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের শতশতযুগসঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।

তবে এস, ভ্রাতৃগণ! সমস্যাটির অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া দেখ! এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। কিন্তু আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের জয় হউক—আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উহাতে ব্রতী হইতে প্রস্তুত থাকিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে! রোগ কি বুঝিলে, ঔষধ কি তাহাও জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না। আমরা হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে ও তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্রের প্রবন্ধসমূহও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।

আমরা কি মানুষ?

ভারতবর্ষের খবরের কাগজে চিকাগো-বৃত্তান্ত হাজির—বড় আশ্চর্যের বিষয়, কারণ আমি যাহা করি, গোপন করিবার যথোচিত চেষ্টা করি। এদেশে আশ্চর্যের বিষয় অনেক। বিশেষ এদেশে দরিদ্র ও স্ত্রী-দরিদ্র নাই বলিলেই হয় ও এদেশের

স্ত্রীদের মতো স্ত্রী কোথাও দেখি নাই! সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মতো মেয়ে বড়ই কম। 'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু'[১]—যে দেবী সুকৃতী পুরুষের গৃহে স্বয়ং শ্রীরূপে বিরাজমানা। এ কথা বড়ই সত্য। এদেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন! সকল কাজ এরাই করে। স্কুল-কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলেদের পথ চলিবার জো নাই। আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়িতে স্থান দিতেছে, খেতে দিচ্ছে—লেকচার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে বলিতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের ঋণমুক্ত হব না।

বাবাজী, শাক্ত শব্দের অর্থ জানো? শাক্ত মানে মদ-ভাঙ্ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এরা তাই দেখে; এবং মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'[২]—যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে। আর এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার-হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রোফেসর—সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র! যাদের পয়সা আছে, তারা দিনরাত গরীবদের উপকারে ব্যস্ত! আর আমরা কি করি? আমার মেয়ে ১১ বৎসরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ, বাবাজী? মনু বলেছেন, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ'—ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করে বিদ্যাশিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।

১। চণ্ডী, ৪।৫
২। মনুসংহিতা, ৩।৫৬

দ্বিতীয় দরিদ্র লোক। যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশাভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, opportunities (সুবিধা) আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎমান্য হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত। গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ২.০০ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? ক-জন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি-ডোম তোমার বাড়ির চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পারো? তোমরা তাদের ছোঁও না, 'দূর দূর' কর। আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু-ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি করছেন? খালি বলছেন, 'ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না'। এমন সনাতন ধর্মকে কি করে ফেলেছে! এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।

আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখতে।

এদের অনেক দোষও আছে। ফল এই, ধর্মবিষয়ে এরা আমাদের চেয়ে অনেক নীচে, আর সামাজিক সম্বন্ধে এরা অনেক উচ্চে। এদের সামাজিক ভাব আমরা গ্রহণ করিব, আর এদের আমাদের অদ্ভুত ধর্ম শিক্ষা দিব।

নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ

জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে কি থাকিবে, এ সম্বন্ধে আমার কিছুই করিবার নাই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতে বা ভারতের বাইরে মনুষ্যজাতি যে মহৎ চিন্তারাশি উদ্‌ভাবন করিয়াছে, তাহা অতি হীন, অতি দরিদ্রের নিকট পর্যন্ত প্রচার করা। তারপর তারা নিজেরা ভাবুক। জাতিভেদ থাকা উচিত কি না, স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। 'চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতার উপরেই নির্ভর করে জীবন, উন্নতি এবং কল্যাণ'। ইহার অভাবে মানুষ, বর্ণ ও জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

জাতিভেদ থাকুক বা নাই থাকুক, কোন মতবাদ প্রচলিত থাকুক বা নাই থাকুক, যে-কোন ব্যক্তি, শ্রেণী, বর্ণ, জাতি বা সম্প্রদায় যদি অপর কোন ব্যক্তির

স্বাধীন চিন্তার ও কার্যের শক্তিতে বাধা দেয় (অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ শক্তি কাহারও অনিষ্ট না করে) তাহা অতি অন্যায়, এবং যে ঐরূপ করে—তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটি যন্ত্র চালাইয়া যাইব—যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর পুরুষই হউক আর নারীই হউক—নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ এবং অন্যান্য জাতি জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা সকলে জানুক। বিশেষতঃ তাহারা দেখুক—অপরে এক্ষণে কি করিতেছে। তারপর তাহারা কি করিবে, স্থির করুক। রাসায়নিক দ্রব্যগুলি আমরা এক সঙ্গে রাখিয়া দিব মাত্র, উহারা প্রকৃতির নিয়মে দানা বাঁধিবে। আমেরিকার মহিলাগণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—তাঁহারা আমার খুব বন্ধু। শুধু চিকাগোয় নয়, সমগ্র আমেরিকায়। তাঁহাদের দয়ার জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা প্রকাশ করা আমার সাধ্য নয়। প্রভু তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করুন। এই দেশে মহিলাগণ সমুদয় জাতীয় কৃষ্টির প্রতিনিধিস্বরূপ। পুরুষেরা কার্যে এত ব্যস্ত যে আত্মোন্নতির সময় পায় না। এখানকার মহিলাগণ প্রত্যেক বড় বড় আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ।

দৃঢ়ভাবে কার্য করিয়া যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়শীল হও এবং প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখো; কাজে লাগো। দুইদিন আগেই হউক আর পরেই হউক, আমি আসিতেছি। আমাদের কার্যের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে—'ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতিবিধান'। মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করে নাই। আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য সকল সংস্কারকার্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না; উহা নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পারো? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখাইতে পারো? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম-বিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হইতে পারো? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। তোমরা সকলে ইহা করিবার জন্যই আসিয়াছ।

আপনাতে বিশ্বাস রাখো। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্যন্ত গরীব ও পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ! একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণ লোকের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত প্রচারকগণের দ্বারা গরীবের বাড়িতে বাড়িতে যাইয়া তাহাদের নিকট বিদ্যা ও ধর্মের বিস্তার—এই ভাবগুলি প্রচার করিতে থাকো। সকলেই যাহাতে এ বিষয়ে সহানুভূতি করে, তাহার চেষ্টা কর।

বড় হতে গেলে কি দরকার?

বড় হইতে গেলে কোন জাতির বা ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি প্রয়োজন ঃ

(১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।

(২) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব

(৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগের সহায়তা।

কি কারণে হিন্দুজাতি তাহার অদ্ভুত বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণাবলী সত্ত্বেও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল? আমি বলি, হিংসা। এই দুর্ভাগা হিন্দুজাতি পরস্পরের প্রতি যেরূপ জঘন্যভাবে ঈর্ষান্বিত এবং পরস্পরের খ্যাতিতে যেভাবে হিংসাপরায়ণ, তাহা কোন কালে কোথাও দেখা যায় নাই। যদি আপনি কখনো পাশ্চাত্য দেশে আসেন, তবে এতদ্দেশবাসীর মধ্যে এই হিংসার অভাবই সর্বপ্রথম আপনার নজরে পড়িবে। ভারতবর্ষে তিন জন লোকও পাঁচ মিনিট কাল একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে না। প্রত্যেকেই ক্ষমতার জন্য কলহ করিতে শুরু করে—ফলে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিই দুরবস্থায় পতিত হয়। হায় ভগবান! কবে আমরা হিংসা না করিবার শিক্ষা লাভ করিব!

এইরূপ একটি জাতির মধ্যে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে এমন একদল লোক সৃষ্টি করা, যাহারা মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য স্নেহ-ভালবাসার সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে—ইহা কি বিস্ময়কর নহে? এই দলের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত হইবে, এই অদ্ভুত উদার ভাব অপ্রতিহতবেগে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িবে, এবং এই দাসজাতির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উৎকট অজ্ঞতা, ঘৃণা, প্রাচীন মূর্খতা, জাতিবিদ্বেষ ও হিংসা প্রভৃতি সত্ত্বেও সমগ্র দেশকে বিদ্যুৎশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিবে।

সাহসী লোকেরাই বড় বড় কাজ করে

বৎস! আমি বুঝছি, আমাকে গিয়ে তোমাদের মানুষ তৈরি করতে হবে। আমি জানি, ভারতে কেবল নারী ও ক্লীবের বাস। সুতরাং বিরক্ত হয়ো না। ভারতে কাজ করবার জন্য উপায় উদ্‌ভাবন আমাকেই করতে হবে। কতকগুলো মস্তিষ্কহীন ক্লীবের হাতে গিয়ে আমি পড়ছি না।

তোমাদের উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই, তোমরা যতটুকু পারো করে যাও, তা যত অল্পই হোক না কেন, আমাকে একলাই আগাগোড়া সব করে যেতে হবে। কলকাতার লোকদের এত সঙ্কীর্ণভাব! আর তোমরা মাদ্রাজীরা কুকুরের ডাকে মূর্ছা যাও! 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' —দুর্বল কখনো এই আত্মাকে লাভ করতে পারে না। আমার জন্য তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই, প্রভু আমার সঙ্গে রয়েছেন। তোমরা কেবল আত্মরক্ষা করে যাও; আমাকে দেখাও যে, তোমরা ঐটুকু করতে পারো, তা হলেই আমি সন্তুষ্ট। কে আমার সম্বন্ধে কি বলছে, তাই নিয়ে আর আমাকে বিরক্ত করো না। আমার সম্বন্ধে কোন আহাম্মকের সমালোচনা শোনবার জন্য আমি বসে নেই। তোমরা শিশু, (জেনে রাখো) কেবল প্রভূত ধৈর্য, অসীম সাহস ও মহতী চেষ্টা দ্বারাই শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়ে থাকে। আমার ভয় হচ্ছে, কিডির মন মাঝে মাঝে যেমন ডিগবাজি খায়, সেই রকম ডিগবাজি খাচ্ছে। কোণ থেকে বেরিয়ে এসে কলম ধরুক না। 'স্বামী, স্বামী' বলে না চেঁচিয়ে ঐ দুষ্টদের বিরুদ্ধে কি মাদ্রাজীরা এখন যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না, যাতে তারা 'ত্রাহি ত্রাহি' চিৎকার করতে থাকে?

তোমরা ভয় পাচ্ছ কিসে? সাহসী লোকেরাই কেবল বড় বড় কাজ করতে পারে—কাপুরুষেরা পারে না। হে অবিশ্বাসিগণ, চিরকালের জন্য জেনে রাখো যে, প্রভু আমায় হাত ধরে নিয়ে চলেছেন। যতদিন আমি পবিত্র থাকব, তাঁর দাস হয়ে থাকব, ততদিন কেউ আমার একটি কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।

সাহসী হও, সাহসী হও! মানুষ একবারই মরে। আমার শিষ্যেরা যেন কখনও কোনমতে কাপুরুষ না হয়।

সত্যিকার জাতি—যারা কুটিরে বাস করে

জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজসংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না—ক্ষতটি কোথায়।

বিধবা-বিবাহের প্রচলন দ্বারা তাঁহারা জাতিকে উদ্ধার করিতে চাহেন। আপনি কি মনে করেন যে, বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপর কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে? আমাদের ধর্মের কোন অপরাধ নাই, কারণ মূর্তিপূজায় বিশেষ কিছু আসে যায় না। সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইবার জন্যই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে। মূর্তিপূজা থাকিবে কি থাকিবে না, কতজন বিধবার পুনর্বার বিবাহ হইবে, জাতিভেদ-প্রথা ভাল কি মন্দ, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আমার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেককেই তাহার নিজের মুক্তির পথ করিয়া লইতে হইবে। রাসায়নিক দ্রব্যের একত্র সমাবেশ করাই আমাদের কর্তব্য—দানাবাঁধার কার্য ঐশ্বরিক বিধানে স্বতঃই হইয়া যাইবে। আসুন, আমরা তাহাদের মাথায় ভাব প্রবেশ করাইয়া দিই—বাকিটুকু তাহারা নিজেরাই করিবে। ইহার অর্থ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও অসুবিধা আছে। দেউলিয়া গভর্নমেন্ট কোন সহায়তা করিবে না, করিতে সক্ষমও নহে; সুতরাং সেদিক হইতে সহায়তার কোন আশা নাই।

ধরুন, যদি আমরা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিতে সক্ষমও হই, তবু দরিদ্রঘরের ছেলেরা সে-সব স্কুলে পড়িতে আসিবে না; তাহারা বরং ঐ সময় জীবিকার্জনের জন্য হালচাষ করিতে বাহির হইয়া পড়িবে। আমাদের না আছে প্রচুর অর্থ—না আছে ইহাদিগকে শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করিবার ক্ষমতা। সুতরাং সমস্যাটি নৈরাশ্যজনক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আমি ইহারই মধ্যে একটি পথ বাহির করিয়াছি। তাহা এই—যদি পর্বত মহম্মদের নিকট না-ই আসে, তবে মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যাইতে হইবে।[১] দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে (অর্থাৎ নিজেরা শিক্ষালাভে তৎপর না হয়), তবে শিক্ষাকেই

---

১ প্রবাদ আছে—মহম্মদ একবার ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'আমি পর্বতকে আমার নিকট ডাকিলে উহা আমার নিকট উপস্থিত হইবে।' এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিবার জন্য মহা জনতা হয়। মহম্মদ পর্বতকে পুনঃপুনঃ ডাকিতে লাগিলেন, তথাপি পর্বত একটুও বিচলিত হইল না। তাহাতে মহম্মদ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'পর্বত যদি মহম্মদের নিকট না আসে মহম্মদ পর্বতের নিকট যাইবে।' তদবধি উহা একটি প্রবাদবাক্যস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যাইতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কিরূপে তাহা সাধিত হইবে? আপনি আমার গুরুভ্রাতাগণকে দেখিয়া থাকিবেন। এক্ষণে ঐরূপ নিঃস্বার্থ, সৎ ও শিক্ষিত শত শত ব্যক্তি সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে আমি পাইব। ইহাদিগকে গ্রামে গ্রামে, প্রতি দ্বারে দ্বারে শুধু ধর্মের নহে, পরন্তু শিক্ষার আলোকও বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। আমাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কাজে লাগাইবার গোড়াপত্তন আমি করিয়াছি।

মানুষের চোখ খুলে দাও

ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল—জনসাধারণের দারিদ্র্য। পাশ্চাত্যদেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি, তুলনায় আমাদের দরিদ্রগণ দেবপ্রকৃতি। সুতরাং আমাদের পক্ষে দরিদ্রের অবস্থার উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা। আমাদের জনগণ ও রাজন্যগণের সম্মুখে এই এক বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু চেষ্টা করা হয় নাই। পুরোহিতশক্তি ও পরাধীনতা তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ। তাহাদিগকে ভাল ভাল ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জানিতে পারে—জগতে কোথায় কি হইতেছে। তাহা হইলে তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নরনারী নিজের উদ্ধার নিজেই সাধন করিয়া থাকে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে—তাহাদিগকে কতকগুলি উচ্চ ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা উহার ফলস্বরূপ আপনিই আসিবে। আমাদের কর্তব্য কেবল রাসায়নিক উপাদানগুলিকে একত্র করা—অতঃপর প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা দানা বাঁধিবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য—কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া, বাকি যাহা কিছু তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে।

ভারতে এই কাজটি করা বিশেষ দরকার। এই চিন্তা অনেকদিন হইতে আমার মনে রহিয়াছে। ভারতে ইহা কার্যে পরিণত করিতে পারি নাই, সেইজন্য এইদেশে আসিয়াছি। দরিদ্রদিগকে শিক্ষাদানের প্রধান বাধা এই : মনে করুন,

গ্রামে গ্রামে গরীবদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তথাপি তাহাতে কোন উপকার হইবে না, কারণ ভারতে দারিদ্র্য এত অধিক যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া পিতাকে তাহার কৃষি-কার্যে সহায়তা করিবে, অথবা অন্য কোনরূপে জীবিকা-অর্জনের চেষ্টা করিবে; সুতরাং যেমন পর্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্বতের নিকট গিয়াছিলেন, সেইরূপ দরিদ্র বালক যদি শিক্ষালয়ে আসিতে না পারে, তবে তাহাদের নিকট শিক্ষা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর, জগতের ধন মান ঐশ্বর্য—সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে।

স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখ

আমাদের জাতের কোনও ভরসা নাই। কোনও একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা, সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমা-সীমান্ত নাই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘন্টা হলো, কাল তার উপর ভেঁপু হলো, পরশু তার ওপর চামর হলো, আজ খাট হলো, কাল খাটের ঠ্যাঙে রূপো বাঁধানো হলো—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হলো—চক্রগদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র ইত্যাদি, একেই ইংরেজীতে imbecility (শারীরিক ও মানসিক বলহীনতা) বলে—যাদের মাথায় ঐ রকম বেল্‌কোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile (ক্লীব)—ঘন্টা ডাইনে বাজবে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দিম দুবার ঘুরবে বা চার বার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিন রাত ঘামতে চায়, তাহাদেরই নাম হতভাগা; আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুঁড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

যদি ভাল চাও তো সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজো করগে,—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ, তার পূজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম; ঘন্টার উপর চামড় চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধ ঘন্টা বসব—এ বিচারের নাম 'কর্ম'

নয়, ওর নাম পাগলা-গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে—মানুষগুলো মরে যাক। তোদের বুদ্ধি নাই যে, এ কথা বুঝিস—আমাদের দেশে মহা ব্যারাম—পাগলা-গারদ দেশময়। ...

যাক, তোদের মধ্যে যারা একটু মাথাওয়ালা আছে, তাঁদের চরণে আমার দণ্ডবৎ ও তাঁদের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁরা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ুন—এই বিরাটের উপাসনা প্রচার করুন, যা আমাদের দেশে কখনও হয় নাই। লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা নয়, সকলের সঙ্গে মিশতে হবে। ... Idea (ভাব) ছড়া গাঁয়ে গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—তবে যথার্থ কর্ম হবে। নইলে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ঘন্টা নাড়া, কেবল রোগ বিশেষ। ... Independent (স্বাধীন) হ, স্বাধীন বুদ্ধি খরচ করতে শেখ্ ...অমুক তন্ত্রের অমুক পটলে ঘন্টার বাঁটের যে দৈর্ঘ্য দিয়েছে, তাতে আমার কি? প্রভুর ইচ্ছায় ক্রোর তন্ত্র, বেদ, পুরাণ তোদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ... যদি কাজ করে দেখাতে পারিস, যদি এক বৎসরের মধ্যে দু-চার লাখ চেলা ভারতে জায়গায় জায়গায় করতে পারিস তবে বুঝি। তবেই তোদের উপর আমার ভরসা হবে, নইলে ইতি।

গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা; লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ। নিজের ভাবনা যখনই ভাববে তুলসী, তখনি মনে অশান্তি। তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজী? সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও তো বাবা। কোনও চিন্তা রেখো না; নরক স্বর্গ ভক্তি বা মুক্তি সব don't care (গ্রাহ্য করো না), আর ঘরে ঘরে নাম বিলোও দিকি বাবাজী। আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি এবং ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও। ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা তেমনি জগৎকে ভালবাস দেখি।

সকলকে একত্র কর। গুণনিধি কোথায়? তাকে তোমাদের কাছে আনবে। তাকে আমার অনন্ত ভালবাসা। গুপ্ত কোথা? সে আসতে চায় আসুক। আমার নাম করে তাকে ডেকে আন। এই ক-টি কথা মনে রেখো—

১। আমরা সন্ন্যাসী, ভক্তি ভুক্তি মুক্তি—সব ত্যাগ।

২। জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।

৩। রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বলো বা ঈশ্বর বলো বা অবতার বলো, আপনার আপনার ভাবে নাও।

৪। যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে। এই বার্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দিকি বাবাজী—অশান্তি দূর হয়ে যাবে। ভয় করো না—ভয়ের জায়গা কোথা? তোমরা তো কিছু চাও না—এতদিন তাঁর নাম, তোমাদের চরিত্র চারিদিকে ছড়িয়েছ, বেশ করেছ; এখন organised (সঙ্ঘবদ্ধ) হয়ে ছড়াও—প্রভু তোমাদের সঙ্গে, ভয় নাই।

আমি মরি আর বাঁচি, দেশে যাই বা না যাই, তোমরা ছড়াও, প্রেম ছড়াও। গুণ্ডকেও এই কাজে লাগাও। কিন্তু মনে রেখো, পরকে মারতে ঢাল খাঁড়ার দরকার। 'সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি'—যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তখন সৎ বিষয়ের জন্য দেহত্যাগই শ্রেয়ঃ।

পূর্বের চিঠি মনে রেখো—মেয়ে-মদ্দ দুইই চাই, আত্মাতে মেয়ে-পুরুষের ভেদ নেই। তাঁকে অবতার বললেই হয় না—শক্তির বিকাশ চাই। হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলার কাজ নেই—ছেলেখেলার সময় নেই—যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাত হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের। Organisation (সঙ্ঘ) চাই—কুঁড়েমি দূর করে দাও, ছড়াও, ছড়াও; আগুনের মতো যাও সব জায়গায়। আমার উপর ভরসা রেখো না, আমি মরি বাঁচি, তোমরা ছড়াও, ছড়াও।

ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ!! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই—এখন ভাতের হাঁড়িতে...।

পূর্বে মহত্তের লক্ষণ ছিল 'ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ'[১] এখন হচ্ছে, আমি পবিত্র আর দুনিয়া অপবিত্র—লাও রূপেয়া, ধরো হামারা পায়েরকা নীচে।

হরমোহন মধ্যে এক দিগ্‌গজ পত্র লেখেন। তাতে প্রধান খবর প্রায়ই এই রকম, যথা—'অমুক ময়রার দোকানে অমুক ছেলে আপনার নিন্দা করিল; তাহাতে অসহ্য হওয়ায় আমি লড়াই করি' ইত্যাদি। কে তাকে লড়াই করিতে বলে, প্রভু জানেন। ...যাক্, তাহার ভালবাসাকে বলিহারি যাই এবং তাহার perseverance (অধ্যবসায়)-কে।

যে মহাপুরুষ—হুজুক সাঙ্গ করে দেশে ফিরে যেতে লিখেছেন, তাঁকে বলো, কুকুরের মতো কারুর পা চাটা আমার স্বভাব নহে। যদি সে মরদ হয় তো একটা মঠ বানিয়ে আমায় ডাকতে বলো। নইলে কার ঘরে ফিরে যাব? এ দেশ আমার more (অধিক) ঘর—হিন্দুস্থানে কি আছে? কে ধর্মের আদর করে? কে বিদ্যের আদর করে? ঘরে ফিরে এস!!! ঘর কোথা?

এবারকার মহোৎসব এমনি করবে যে, আর কখনও তেমন হয় নাই। আমি একটা 'পরমহংস মহাশয়ের জীবনচরিত' লিখে পাঠাব। সেটা ছাপিয়ে ও তর্জমা করে বিক্রি করবে। বিতরণ করলে লোকে পড়ে না, কিছু দাম লইবে। হুজুকের শেষ!!! ...এই তো কলির সন্ধ্যে। আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না; আমি লাখ নরকে যাব, 'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ' (বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করে)—এই আমার ধর্ম। আমি কুঁড়ে, নিষ্ঠুর, নির্দয় স্বার্থপর ব্যক্তিদের সহিত কোন সংস্রব রাখিতে চাই না। যাহার ভাগ্যে থাকে, সে এই মহাকার্যে সহায়তা করিতে পারে।

শিক্ষা কি? ধর্ম কি?

(১) শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।

(২) ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।

১। ত্রিভুবনের হিত করিতে যিনি ভালবাসেন।

সুতরাং উভয় স্থলেই শিক্ষকের কার্য কেবল পথ থেকে সব অন্তরায় সরিয়ে দেওয়া। আমি যেমন সর্বদা বলে থাকি : 'অপরের অধিকারে হাত দিও না, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য, রাস্তা সাফ করে দেওয়া।

সুতরাং তোমরা যখন বারবার ভাবো যে, ধর্মের কাজ কেবল আত্মাকে নিয়ে, সামাজিক বিষয়ে তার হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই, তখন তোমাদের এ কথাও মনে রাখা উচিত, যে অনর্থ আগে থেকেই হয়ে গিয়েছে সে-সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। এ কি রকম জানো? যেন কোন লোক জোর করে একজনের বিষয় কেড়ে নিয়েছে; এখন বঞ্চিত ব্যক্তি যখন তার বিষয় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে, তখন প্রথম ব্যক্তি নাকী সুরে চিৎকার শুরু করলে, আর 'মানুষের অধিকার'রূপ মতবাদ যে কত পবিত্র, তা প্রচার করতে লাগলো!

সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে পুরুতগুলোর অত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কী দরকার ছিল? তাতেই তো লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কষ্ট পাচ্ছে!

তোমরা মাংসাহারী ক্ষত্রিয়দের কথা বলছ। ক্ষত্রিয়েরা মাংস খাক আর নাই খাক, তারাই হিন্দুধর্মের ভিতর যা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিস রয়েছে, তার জন্মদাতা। উপনিষদ্ লিখেছিলেন কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবাইকে ধর্মের অধিকার দিয়েছেন; আর যখনই ব্রাহ্মণেরা কিছু লিখেছেন, তাঁরা অপরকে সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। আহাম্মক, গীতা আর ব্যাসসূত্র পড় অথবা আর কারো কাছে শুনে নাও। গীতায় সকল নরনারী, সকল জাতি, সকল বর্ণের জন্য পথ উন্মুক্ত রয়েছে; আর ব্যাস গরীব শূদ্রদের বঞ্চিত করবার জন্য বেদের স্বকপোলকল্পিত মানে করেছেন। ঈশ্বর কি তোমাদের মতো ভীরু আহাম্মক যে, এক টুকরো মাংসে তাঁর দয়া-নদীতে চড়া পড়ে যাবে? যদি তাই হয়, তবে তাঁর মূল্য এক কানাকড়িও নয়। যাক্, ঠাট্টা থাক। কি প্রণালীতে তোমাদের চিন্তাকে নিয়মিত করতে হবে, এ চিঠিতে তার গোটাকতক সঙ্কেত দিলাম।

আমার কাছ থেকে কিছু আশা করো না। তোমাকে পূর্বেই লিখেছি ও বলেছি, আমার স্থির বিশ্বাস—মাদ্রাজীদের দ্বারাই ভারতের উদ্ধার হবে। তাই বলছি, হে যুবকবৃন্দ, তোমাদের মধ্যে গোটাকতক লোক এই নূতন ভগবান রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র

করে এই নূতনভাবে একেবারে মেতে উঠতে পারো কি? ভেবে দেখো; উপাদান সংগ্রহ করে একখানা সংক্ষিপ্ত রামকৃষ্ণ-জীবনী লেখো দেখি। সাবধান, যেন তার মধ্যে কোন অলৌকিক ঘটনা সমাবেশ করো না—অর্থাৎ জীবনীটি লেখা হবে তাঁর উপদেশের উদাহরণস্বরূপ। তার মধ্যে কেবল তাঁর কথা থাকবে। খবরদার, এর মধ্যে আমাকে বা অন্য কোন জীবিত ব্যক্তিকে যেন এনো না। প্রধান লক্ষ্য থাকবে তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ জগৎকে দেওয়া, আর জীবনীটি তাঁরই উদাহরণস্বরূপ হবে। তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনা সাধারণের জন্য নয়। আমি অযোগ্য হলেও আমার উপর একটি কর্তব্য ন্যস্ত ছিল—যে রত্নের কৌটা আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে এসে তোমাদের হাতে দেওয়া।

কপট, হিংসুক, দাসভাবাপন্ন, কাপুরুষ, যারা কেবল জড়ে বিশ্বাসী, তারা কখনও কিছু করতে পারে না। ঈর্ষাই আমাদের দাসসুলভ জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। ঈর্ষা থাকলে সর্বশক্তিমান ভগবানও কিছু করে উঠতে পারেন না।

আমার সম্বন্ধে মনে কর, যা কিছু করবার ছিল, সব শেষ করেছি; এইটি ভাবো যে, সব কাজের ভার তোমাদের ঘাড়ে। হে যুবকবৃন্দ, ভাবো যে তোমরা এই কাজ করবার জন্য বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট। তোমরা কাজে লাগো, ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন। আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ভুলে যাও, কেবল রামকৃষ্ণকে প্রচার কর; তাঁর উপদেশ, তাঁর জীবনী প্রচার কর। কোন লোকের বিরুদ্ধে, কোন সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলো না। জাতিভেদের সপক্ষে বিপক্ষে কিছু বলো না, অথবা সামাজিক কোন কুরীতির বিরুদ্ধেও কিছু বলবার দরকার নেই। কেবল লোককে বলো, 'গায়ে পড়ে কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যেও না', তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আলাসিঙ্গা, জি. জি., বালাজী ও ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা কর, তারা এটা পারবে কিনা। সাহসী, দৃঢ়নিষ্ঠ, প্রেমিক যুবকবৃন্দ, তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানবে।

মেয়েদের নিচে ফেলে কেউ উঠতে পারে না

ভায়া, সব যায়, ওই পোড়া হিংসেটা যায় না। আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা। হামবড়া, আর কেউ বড় হবে না।

এদেশের মেয়ের মতো মেয়ে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী—মেয়েরাই এদেশের সব। বিদ্যে বুদ্ধি সব তাদের ভেতর। 'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু' (যিনি পুণ্যবানদের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিণী) এদেশে, আর 'পাপাত্মনাং হৃদয়েষ্বলক্ষ্মীঃ' (পাপাত্মগণের হৃদয়ে অলক্ষ্মীস্বরূপিণী) আমাদের দেশে, এই বোঝ। হরে, হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। 'ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীঃ' ইত্যাদি—(তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমি লজ্জাস্বরূপিণী)। 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' (যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা) ইত্যাদি। এদেশের বরফ যেমনি সাদা, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন পবিত্র। আর আমাদের দশ বৎসরের বেটা-বিউনিরা!!! প্রভো, এখন বুঝতে পারছি। আরে দাদা, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' (যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দ করেন)—বুড়ো মনু বলেছে। আমরা মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে। বাপ, আকাশ-পাতাল ভেদ!! 'যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ' (যথোপযুক্তভাবে কর্মফল বিধান করেন)।[১] প্রভু কি গপ্পিবাজিতে ভোলেন? প্রভু বলেছেন, 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী' ইত্যাদি— (তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই বালক ও তুমিই বালিকা)।[২] আর আমরা বলছি—'দূরমপসর রে চণ্ডাল' (ওরে চণ্ডাল, দূরে সরিয়া যা), 'কেনৈষা নির্মিতা নারী মোহিনী' (কে এই মোহিনী নারীকে নির্মাণ করিয়াছে?) ইত্যাদি। ওরে ভাই, দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি, উচ্চজাতির নীচের উপর যে অত্যাচার! মন্দিরে যে দেবদাসীদের নাচার ধুম! যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের 'ছুঁৎমার্গ', খালি 'আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না'। হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু-হাজার বৎসর খালি বিচার করছে—ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে; ডান দিক থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক থেকে এবং ফট্ ফট্ স্বাহা, ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ করে, তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে? 'কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ' (সকলে নিদ্রিত হয়ে থাকলেও কাল জাগরিত থাকেন, কালকে অতিক্রম করা বড় কঠিন)। তিনি জানছেন, তাঁর চক্ষে কে ধুলো দেয় বাবা!

১। ঈশ উপ.
২। শ্বেতাশ্বতর উপ.

দাদা, এটি তলিয়ে বোঝ—ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এ দেশ দেখেছি। কারণ বিনা কার্য হয় কি? পাপ বিনা সাজা মিলে কি? সর্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্। পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥ (সমুদয় শাস্ত্র ও পুরাণে ব্যাসের দুটি বাক্য—পরোপকার করিলে পুণ্য ও পরপীড়ন করিলে পাপ উৎপন্ন হয়।) সত্য নয় কি?

দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজী বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।

মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কোন্ কাজ করে? —তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী—গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা। এ সমস্ত প্ল্যান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখতে পারি না। ফলকথা—পাহাড় যদি মহম্মদের নিকট না যায়, মহম্মদ পাহাড়ের নিকট যাবেন। অর্থাৎ গরীবের ছেলেরা যদি স্কুলে এসে লেখাপড়া শিখতে না পারে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের শেখাতে হবে। গরীবেরা এত গরীব, তারা স্কুল পাঠশালে আসতে পারে না। আর কবিতা-ফবিতা পড়ে তাদের কোনও উপকার নাই। আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেইজন্যই ভারতে এত দুঃখকষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে—নীচ জাতকে তুলতে হবে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই তাদের পায়ে দলেছে। আবার তাদের উঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে আনতে হবে—গোঁড়া হিন্দুদেরই এ কাজ করতে হবে। সব দেশেই যা কিছু দোষ দেখা যায়, তা তাদের ধর্মের দোষ নয়, ধর্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুনই এই-সব দোষ দেখা যায়। সুতরাং ধর্মের কোন দোষ নাই, লোকেরই দোষ।

এই করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গুরুর কৃপায় প্রতি শহরে আমি ১০/১৫ জন লোক পাব। পয়সার চেষ্টায় তারপর ঘুরলাম। ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে!!! মূর্খ, ভীমরতিগ্রস্ত ও স্বার্থপরতার মূর্তি—তারা দেবে! তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার করব, করে দেশে যাব আর আমার বাকী জীবন এই এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করব।

যেমন আমাদের দেশে social virtue-র (সমাজ-হিতকর গুণের) অভাব, তেমনি এ দেশে spirituality (আধ্যাত্মিকতা) নাই; এদের spirituality দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে। কত দিনে সিদ্ধকাম হবো জানি না, আমাদের মতো এরা hypocrite (কপট) নয়, আর jealousy (ঈর্ষা) একেবারে নাই। হিন্দুস্থানের কারও উপর depend (নির্ভর) করি না। নিজে প্রাণপণ করে রোজগার করে নিজের plans carry out (উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত) করব or die in the attempt (কিংবা ঐ চেষ্টায় মরব)। 'সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি'—(যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন সৎ উদ্দেশ্যে দেহত্যাগ করাই ভাল)।

তোমরা হয়তো মনে করতে পার, কি Utopian nonsense (অসম্ভব বাজে কথা)। You little know what is in me (আমার ভিতর কি আছে, তোমরা মোটেই জানো না)। আমাদের ভেতর যদি কেউ আমায় সহায়তা করে in my plan (আমার পরিকল্পনা সফল করতে)—all right (খুব উত্তম); নইলে কিন্তু গুরুদেব will show me the way out (আমাকে পথ দেখাইবেন)।

এটি সকলকে বলিও, সকলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিও—সকলে jealousy ত্যাগ করে এককাট্টা হয়ে থাকতে পারবে কিনা। যদি না পারে, যারা হিংসুটেপনা না করে থাকতে পারে না, তাদের ঘরে যাওয়াই ভাল, আর সকলের কল্যাণের জন্য। ঐটে আমাদের জাতের দোষ, national sin (জাতিগত পাপ)!!! এদেশে ঐটে নাই, তাই এরা এত বড়।

আমাদের মতো কূপমণ্ডুক তো দুনিয়ায় নাই। কোন একটা নূতন জিনিস কোন দেশ থেকে আসুক দিকি, আমেরিকা সকলের আগে নেবে। আর আমরা? 'আমাদের মতো দুনিয়ায় কেউ নেই, আর্যবংশ'!!! কোথায় বংশ তা জানিনা...এক লাখ লোকের দাবানিতে ৩০০ মিলিয়ান (ত্রিশ কোটি) কুকুরের মত ঘোরে, আর তারা 'আর্যবংশ'!!!

নেতা হতে যেও না, সেবা কর

তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে এবং আমাদের কাজ যাহাতে অগ্রসর হয়, তাহার চেষ্টা কর। বিশ্বাস কর যে তোমরা সব করিতে পারো। জানিয়া রাখো যে, প্রভু আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, আর অগ্রসর হও, হে বীরহৃদয় বালকগণ!

আমার দেশ আমাকে যথেষ্ট আদর করিয়াছে। আদর করুক আর নাই করুক, তোমরা ঘুমাইয়া থাকিও না, তোমরা শিথিল-প্রযত্ন হইও না। মনে রাখিবে যে, আমাদের উদ্দেশ্যের এক বিন্দুও এখনও কার্যে পরিণত হয় নাই। শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে কার্য কর, তাহাদিগকে একত্র করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ কর। বড় বড় কাজ কেবল খুব স্বার্থত্যাগ দ্বারাই হইতে পারে। স্বার্থের আবশ্যকতা নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়—তা তোমারও নয়, আমারও নয় বা আমার গুরুর পর্যন্ত নয়। ভাব ও সঙ্কল্প যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর; হে বীরহৃদয় মহান বালকগণ! উঠে পড়ে লাগো! নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কার্য কর। মনে রাখিও—'তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ'—অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়। তোমাদের সকলের উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক! তাঁহার শক্তি তোমাদের সকলের ভিতর আসুক—আমি বিশ্বাস করি, তাঁহার শক্তি তোমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। বেদ বলিতেছেন, 'ওঠ, জাগো, যত দিন না লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতেছ, থামিও না'। জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিনের আলো দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না। আমি পত্রের উত্তর দিতে দেরি করিলে বিষণ্ন হইও না বা নিরাশ হইও না। লেখায়—আঁচড় কাটায় কি ফল? উৎসাহ, বৎস, উৎসাহ—প্রেম, বৎস, প্রেম। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। আর ভয় করিও না, সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ভয়!

সকলকে আমার আশীর্বাদ। মাদ্রাজের যে-সকল মহানুভব ব্যক্তি আমাদের কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার অনন্ত কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানাইতেছি। কিন্তু আমি তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাঁহারা কার্যে শৈথিল্য না করেন। চারিদিকে ভাব ছড়াইতে থাকো। গর্বিত হইও না। গোঁড়াদের মতো জোর করিয়া কাহাকেও কিছু বিশ্বাস করিবার জন্য পীড়াপীড়ি

করিও না, কোন কিছুর বিরুদ্ধেও বলিও না। আমাদের কাজ কেবল ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য একত্র রাখিয়া দেওয়া। প্রভু জানেন, কিরূপে ও কখন তাহারা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে। সর্বোপরি আমার বা তোমাদের কৃতকার্যতায় গর্বিত হইও না, বড় বড় কাজ এখনও করিতে বাকি। যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহার সহিত তুলনায় এই সামান্য সিদ্ধি অতি তুচ্ছ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, জনসাধারণকে এবং দরিদ্রদিগকে সুখী করিতে হইবে; আর আনন্দিত হও যে, তোমরাই তাঁহার কার্য করিবার নির্বাচিত যন্ত্র। ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে—অদম্য, অনন্ত, সর্বগ্রাসী। সকলেই সম্মুখে যাও, সকলের শুভেচ্ছা উহার সহিত যোগ দাও। সকল হস্ত উহার পথের বাধা সরাইয়া দিক। জয়! প্রভুর জয়!!

আমার কোন সাহায্যের আবশ্যকতা নাই। তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি ফণ্ড খুলিবার চেষ্টা কর। শহরের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকা নির্মিত কুটির ও হল প্রস্তুত কর। গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীব অনুন্নত, এমনকি, চণ্ডালগণকে পর্যন্ত জড়ো কর; তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম উপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও। আর ক্রমশঃ এই সঙ্ঘ বাড়াইতে থাকো—উহার পরিধি বাড়িতে থাকুক। তোমরা যতটুকু পারো, কর। যখন নদীতে জল কিছুই থাকিবে না, তখন পার হইব বলিয়া বসিয়া থাকিবে না। পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতির পরিচালন ভাল, সন্দেহ নাই; কিন্তু চিরকাল চিৎকার ও কলমপেশা অপেক্ষা প্রকৃত কার্য—যতই সামান্য হউক, অনেক ভাল। ভট্টাচার্যের গৃহে একটি সভা আহ্বান কর। কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পূর্বে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, সেইগুলি ক্রয় কর। একটি কুটির ভাড়া লও এবং কাজে লাগিয়া যাও। পত্রিকাদি গৌণ, ইহাই মুখ্য। যে কোনরূপেই হউক, সাধারণ দরিদ্রলোকের মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তার করিতেই হইবে। কার্যের সামান্য আরম্ভ দেখিয়া ভয় পাইও না, কাজ সামান্য হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর। নেতৃত্বের

এই পাশব প্রবৃত্তি জীবনসমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্যন্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও এবং কাজ কর। আমার যাহা যাহা বলিবার ছিল, তোমাদিগকে সব লিখিতে পারিলাম না। হে বীরহৃদয় বালকগণ! প্রভু তোমাদিগকে সব বুঝাইয়া দিবেন। লাগো, লাগো, বৎসগণ! প্রভুর জয়!

এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও

সমাজকে, জগৎকে electrify (বৈদ্যুতিকশক্তিসম্পন্ন) করতে হবে। বসে বসে গপ্পবাজির আর ঘন্টা নাড়ার কাজ? ঘন্টা নাড়া গৃহস্থের কর্ম, মহীন্দ্র মাস্টার, রামবাবু করুন গে। তোমাদের কাজ distribution and propagation of thought-currents (ভাব প্রবাহ বিস্তার)। তাই যদি পারো তবে ঠিক, নইলে বেকার। রোজগার করে খাওগে। মিছে eating the begging bread of idleness is of no use (অনায়াসলব্ধ ভিক্ষান্ন খাওয়া নিরর্থক) বুঝলে বাপু?

Character formed (চরিত্র গঠিত) হয়ে যাক, তারপর আমি আসছি, বুঝলে? দু হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে-মদ্দ—বুঝলে? গৌর-মা, যোগেন-মা, গোলাপ-মা কি করছেন? চেলা চাই at any risk (যে-কোন রকমে হোক)। তাঁদের গিয়ে বলবে আর তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা কর। গৃহস্থ চেলার কাজ নয়, ত্যাগী—বুঝলে? এক এক জনে ১০০ মাথা মুড়িয়ে ফেল, young educated men—not fools (শিক্ষিত যুবক—আহাম্মক নয়), তবে বলি বাহাদুর। হুলস্থূল বাঁধাতে হবে, হুঁকো ফুঁকো ফেলে কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে যাও। তারকদাদা, মদ্রাজ কলিকাতার মাঝে বিদ্যুতের মতো চক্র মারো দিকি, বার কতক। জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) কর, খালি চেলা কর, মায় মেয়ে-মদ্দ, যে আসে দে মাথা মুড়িয়ে, তারপর আমি আসছি। মহা spiritual tidal wave (আধ্যাত্মিক বন্যা) আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

Life is ever expanding, contraction is death (জীবন হচ্ছে সম্প্রসারণ, সঙ্কোচনই মৃত্যু)। যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি

করছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ (অপরে কৃপার পাত্র)। যে এই মহা সন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ (বাণী প্রচার) করবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে, বাকি যে তা না পারো—তফাত হয়ে যাও এই বেলা ভালয় ভালয়।

এই চিঠি তোমরা পড়বে—যোগেন-মা, গোলাপ-মা সকলকে শুনাবে। এই test (পরীক্ষা), যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, 'প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ' (প্রাণ দিয়েও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তারা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাত হয়ে যাক, এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন; এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, Onward, onward (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও)। মেয়ে-মদ্দে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে—Onward, onward, নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য—আর কিছু নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখছ না? এ কি ছেলেখেলা, এ কি জ্যাঠামি, এ কি চ্যাংড়ামি—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—হরে হরে। তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখতে পারছি না—Onward, এই কথাটা খালি বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার spirit (শক্তি) আসবে, বিশ্বাস কর। Onward, হরে হরে। চিঠি বাজার করো না। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। Onward, হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁশিয়ার—তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।

ভয়? কার ভয়? কিসের ভয়?

যে যা বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। বলে—একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর; বলি, প্রথমে

আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। Have faith in yourself, all power is in you. Be conscious and bring it out[১]—বল্, আমি সব করতে পারি। 'নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়।' খবরদার, No 'নেই নেই' (নেই নেই নয়); বল—'হাঁ হাঁ', 'সোঽহং সোঽহং'।

কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ
আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ ॥[২]

মহা হুঙ্কারের সহিত কার্য আরম্ভ করে দাও। ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়? কূর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্।[৩] ডর? কার ডর? কাদের ডর?

ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ
নাস্তিক্যন্ত্বিদন্তু অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যন্ত্বিদন্তু চিনুমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্ ॥

পীত্বা পীত্বা পরমপীযূষং বীতসংসাররাগাঃ
হিত্বা হিত্বা সকলকলহপ্রাপিণীং স্বার্থসিদ্ধিম্।
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা শ্রীগুরুচরণং সর্বকল্যাণরূপং
নত্বা নত্বা সকলভুবনং পাতুমামন্ত্রয়ামঃ ॥

প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহর ব্রহ্মাদিদেবৈর্বলম্।

১। নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, সমুদয় শক্তি তোমার ভিতরে—এইটি জানো এবং ঐ শক্তিকে অভিব্যক্ত কর।

২। হে সখে, কেন কাঁদিতেছ? তোমাতেই তো সব শক্তি রহিয়াছে। হে ভগবন্, তোমার ঐশ্বর্যশালী স্বরূপ জাগ্রত কর। এই ত্রিভুবন সমস্তই তোমার পাদমূলে। জড়ের কোন ক্ষমতা নাই—আত্মার শক্তিই প্রবল।

৩। তারকা চর্বণ করিব, ত্রিভুবন বলপূর্বক উৎপাটন করিব, আমাদের কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণদাস।

পূর্ণং যত্ত্ব প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাং
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ ॥[১]

ইংরেজী লেখাপড়া-জানা young men (যুবক)-দের ভিতর কার্য করতে হবে। 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' (ত্যাগের দ্বারাই অনেকে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন)। ত্যাগ, ত্যাগ—এইটি খুব প্রচার করা চাই। ত্যাগী না হলে তেজ হবে না। কার্য আরম্ভ করে দাও। তোমরা যদি একবার গোঁ ভরে কার্য আরম্ভ করে দাও, তাহলে আমি বোধ হয় কিছুদিন বিরাম লাভ করতে পারি।

বাবুরাম, যোগেন এত ভুগছে কেন? —'দীনাহীনা' ভাবের জ্বালায়। ব্যাম-ফ্যাম সব ঝেড়ে ফেলে দিতে বলো—এক ঘন্টার মধ্যে সব ব্যাম-ফ্যাম সেরে যাবে। আত্মাতে কি ব্যামো ধরে নাকি? ছুট্! ঘন্টাভর বসে ভাবতে বলো—'আমি আত্মা—আমাতে আবার রোগ কি?' সব চলে যাবে। তোমরা সকলে ভাবো—'আমরা অনন্ত বলশালী আত্মা'; দেখ দিকি কি বল বেরোয়। 'দীনাহীনা!' কিসের 'দীনাহীনা'? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা! কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব? 'দীনাহীনা' ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় কর দিকি। সব মঙ্গল হবে। No negative, all positive, affirmative–I am, God is and everything is in me. I will manifest health, purity, knowledge, whatever I want.[২] আরে, এরা ম্লেচ্ছগুলো আমার কথা বুঝতে লাগলো, আর তোমরা বসে বসে 'দীনাহীনা' ব্যামোয় ভোগ? কার ব্যামো—কিসের রোগ? ঝেড়ে ফেলে দে! বলে, 'আমি কি তোমার মত বোকা?'

১। দেহকেই যাহারা আত্মা বলিয়া জানে, তাহারা কাতর হইয়া সকরুণভাবে বলে—আমরা ক্ষীণ ও দীন; ইহাই নাস্তিক্য। আমরা যখন অভয়পদে অবস্থিত, তখন আমরা ভয়শূন্য এবং বীর হইব। ইহাই আস্তিক্য। আমরা রামকৃষ্ণদাস।

সংসারে আসক্তিশূন্য হইয়া, সকল কলহের মূল স্বার্থসিদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমামৃত পান করিতে করিতে সর্বকল্যাণস্বরূপ শ্রীগুরুর চরণ ধ্যান করিয়া, সমস্ত পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া, তাহাদিগকে ঐ অমৃত পান করিতে আহ্বান করিতেছি।

অনাদি অনন্ত বেদরূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে, ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদি দেবতা যাহাতে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যাহা নারায়ণ অর্থাৎ ভগবানের প্রাণসারের দ্বারা পূর্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অমৃতের পূর্ণপাত্রস্বরূপ দেহধারণ করিয়াছেন।

২। নাস্তিভাবদ্যোতক কিছু থাকিবে না, সবই অস্তিভাবদ্যোতক হওয়া চাই—যথা : আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, আর সমুদয় আমার মধ্যে আছে। আমার যা কিছু প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, পবিত্রতা, জ্ঞান সবই আমি আমার ভিতর অভিব্যক্ত করব।

আত্মায় আত্মায় কি ভেদ আছে? গুলিখোর জল ছুঁতে বড় ভয় পায়। 'দীনাহীনা' কি এইসি তেইসি—নেই মাঙ্গতা 'দীনাক্ষীণা'! 'বীর্যমসি বীর্যং, বলমসি বলম্, ওজোঽসি ওজঃ, সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি'।[১] রোজ ঠাকুরপূজার সময় যে আসন প্রতিষ্ঠা—আত্মানম্ অচ্ছিদ্রং ভাবয়েৎ (আত্মাকে অচ্ছিদ্র ভাবনা করিবে)—ওর মানে কি ...? বলো—আমার ভেতর সব আছে, ইচ্ছা হলে বেরুবে। তুমি নিজের মনে মনে বলো, বাবুরাম যোগেন আত্মা—তারা পূর্ণ, তাদের আবার রোগ কি? বলো ঘন্টাখানেক দু-চার দিন। সব রোগ বালাই দূর হয়ে যাবে।

শত্রুর দুর্গ অধিকার কর

আপনি কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—তদ্বিষয়ে প্রথমে বক্তব্য এই যে, 'ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ'ই হওয়া উচিত; তবে আমার অতি প্রিয় বন্ধু মিস মূলারের প্রমুখাৎ আপনার উদারবুদ্ধি, স্বদেশবাৎসল্য ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের অনেক কথা শুনিয়াছি এবং আপনার বিদুষীত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। অতএব আপনি যে আমার ক্ষুদ্র জীবনের অতি ক্ষুদ্র চেষ্টার কথা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া অত্র ক্ষুদ্র পত্রে যথাসম্ভব নিবেদন করিলাম। কিন্তু প্রথমতঃ আপনার বিচারের জন্য আমার অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ভবৎসন্নিধানে উপস্থিত করিতেছি ঃ আমরা চিরকাল পরাধীন, অর্থাৎ এ ভারতভূমে সাধারণ মানবের আত্মস্বত্ববুদ্ধি কখনও উদ্দীপিত হইতে দেওয়া হয় নাই। পাশ্চাত্যভূমি আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দ্রুতপদে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এ ভারতে কৌলিন্যপ্রথা হইতে ভোজ্যাভোজ্য পর্যন্ত সকল বিষয় রাজাই নির্ধারণ করিতেন। পাশ্চাত্যদেশে সমস্তই প্রজারা আপনারা করেন।

এক্ষণে রাজা সামাজিক কোনও বিষয়ে হাত দেন না, অথচ ভারতীয় জনমানবের আত্মনির্ভরতা দূরে থাকুক, আত্মপ্রত্যয় পর্যন্ত এখনও অণুমাত্র হয় নাই। যে আত্মপ্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি তাহা এখনও ব্যবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্রও পরিণত হয় নাই। এই জন্যই আমরা বিজাতীয় রাজার অধীনে এত অধিক স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীত হই। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাধারণে আন্দোলনের দ্বারা কোনও মহৎকার্য সাধন করার চেষ্টা বৃথা, 'মাথা নেই তার মাথা

১। তুমি বীর্যস্বরূপ, আমায় বীর্যবান কর; তুমি বলস্বরূপ, আমায় বলবান কর; তুমি ওজঃস্বরূপ, আমায় ওজস্বী কর ; তুমি সহ্যশক্তি, আমায় সহনশীল কর।

ব্যথা'—সাধারণ কোথা? তাহার উপর আমরা এতই বীর্যহীন যে, কোন বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে তাহাতেই আমাদের বল নিঃশেষিত হয়, কার্যের জন্য কিছুমাত্রও বাকি থাকে না; এইজন্যই বোধ হয় আমরা প্রায়ই বঙ্গভূমে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' সতত প্রত্যক্ষ করি। দ্বিতীয়তঃ যে প্রকার পূর্বেই লিখিয়াছি—ভারতবর্ষের ধনীদিগের নিকট কোনও আশা করি না। যাহাদের উপর আশা, অর্থাৎ যুবক সম্প্রদায়—ধীর, স্থির অথচ নিঃশব্দে তাহাদিগের মধ্যে কার্য করাই ভাল। এক্ষণে কার্য : 'আধুনিক সভ্যতা' পাশ্চাত্যদেশের ও 'প্রাচীন সভ্যতা' ভারত, মিসর, রোমকাদি দেশের মধ্যে সেইদিন হইতেই প্রভেদ আরম্ভ হইল, যেদিন হইতে শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি উচ্চজাতি হইতে ক্রমশঃ নিম্নজাতিদিগের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধুম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানাস্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজসংস্কারসভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না! মুসলমান কয়জন সিপাহী আনিয়াছিল? ইংরেজ কয়জন আছে? ছ-টাকার জন্য নিজের পিতা ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে, এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া কোথায় পাওয়া যায়? সাত-শ বৎসর মুসলমান রাজত্বে ছ-কোটি মুসলমান, এক-শ বৎসর ক্রিশ্চান রাজত্বে কুড়ি লক্ষ ক্রিশ্চান—কেন এমন হয়? Originality (মৌলিকতা) একেবারে দেশকে কেন ত্যাগ করিয়াছে? আমাদের দক্ষহস্ত শিল্পী কেন ইউরোপীয়দের সহিত সমকক্ষতা করিতে না পারিয়া দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে? কি বলেই বা জার্মান শ্রমজীবী ইংরেজ শ্রমজীবীর বহুশতাব্দীপ্রোথিত দৃঢ় আসন টলমলায়মান করিয়া তুলিয়াছে?

কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইওরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম।

শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের—ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish colonists (আইরিশ ঔপনিবেশিকগণ) আসিতেছে—ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ-মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে; তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নাই। কেন এমন হলো? আমার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ Irishman -কে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল, 'প্যাট (Pat[১]), তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।' আজন্ম শুনিতে শুনিতে প্যাট-এর তাই বিশ্বাস হলো, নিজেকে প্যাট হিপনটাইজ (সম্মোহিত) করলে যে, সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল—'প্যাট, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই তো সব করেছে, তোর আমার মতো মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ।' প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ইত্যাদি।

ঐ প্রকার আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে, তাও একান্ত negative (নেতিভাবপূর্ণ)—স্কুল-বালক কিছুই শিখে না, কেবল সব ভেঙ্গে চুরে যায়—ফল 'শ্রদ্ধাহীনত্ব'। যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সে 'শ্রদ্ধা'র লোপ। 'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'—গীতা। তাই আমরা বিনাশের এত নিকট। এক্ষণে উপায়—শিক্ষার প্রচার। প্রথম আত্মবিদ্যা—ঐ কথা বললেই যে জটাজূট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার মন্তব্য তা নয়। তবে কি? যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়। মুক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ—এ সকল তো মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ; কিন্তু 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শৈবসিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি যে-কোন সম্প্রদায় এ ভারতে উঠিয়াছে, সকলেই এইখানে একবাক্য

১। Patrick, প্যাট্রিক—আইরিশম্যান (চলিত ভাষায়)

যে, এই 'জীবাত্মা'তেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপীলিকা হতে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে সেই 'আত্মা',—তফাত কেবল প্রকাশের তারতম্য, 'বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'—(পাতঞ্জলযোগসূত্রম্)। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশ কাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু বিকাশ হোক বা না হোক, সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্তমান—আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত। এই শক্তির উদ্বোধন করতে হবে দ্বারে দ্বারে যাইয়া। দ্বিতীয়, এই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা দিতে হবে। কথা তো হলো সোজা, কিন্তু কার্যে পরিণত হয় কি প্রকারে? এই আমাদের দেশে সহস্র সহস্র নিঃস্বার্থ, দয়াবান, ত্যাগী পুরুষ আছেন; ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ (এক) অর্ধেক ভাগকে—যেমন তাঁহারা বিনা বেতনে পর্যটন করে ধর্মশিক্ষা দিচ্ছেন—ঐ প্রকার বিদ্যাশিক্ষক করানো যেতে পারে। তাহার জন্য চাই, প্রথমতঃ এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া। মদ্রাজ ও কলিকাতায় সম্প্রতি দুটি কেন্দ্র হইয়াছে; আরও শীঘ্র হইবার আশা আছে। তারপর দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আইসে নাই। ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখানো যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে। ঐ কর্মশালার মালবিক্রয় যাহাতে ইওরোপে ও আমেরিকায় হয়, তজ্জন্য উক্ত দেশসমূহেও সভা স্থাপনা হইয়াছে ও হইবে। কেবল মুশকিল এক, যে প্রকার পুরুষদের জন্য হইবে, ঠিক ঐ ভাবেই স্ত্রীলোকদের জন্য চাই, কিন্তু এদেশে তাহা অতীব কঠিন, আপনি বিদিত আছেন। পুনশ্চ এই সমস্ত কার্যের জন্য যে অর্থ চাই, তাহাও ইংলণ্ড হইতে আসিবে। যে-সাপে কামড়ায়, সে নিজের বিষ উঠাইয়া লইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং তজ্জন্য আমাদের ধর্ম ইওরোপ ও আমেরিকায় প্রচার হওয়া চাই! আধুনিক বিজ্ঞান খ্রীষ্টাদি ধর্মের ভিত্তি একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর বিলাস—ধর্মবৃত্তিই প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিল। ইওরোপ ও আমেরিকা আশাপূর্ণনেত্রে ভারতের দিকে তাকাইতেছে—এই সময় পরোপকারের, এই সময় শত্রুর দুর্গ অধিকার করিবার।

পাশ্চাত্যদেশে নারীর রাজ্য, নারীর বল, নারীর প্রভুত্ব। যদি আপনার ন্যায় তেজস্বিনী বিদুষী বেদান্তজ্ঞা কেউ এই সময়ে ইংলণ্ডে যান আমি নিশ্চিত বলিতেছি, এক এক বৎসরে অন্ততঃ দশ হাজার নরনারী ভারতের ধর্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবে। এক রমাবাই অস্মদ্দেশ হইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষা বা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিল্পাদিবোধ অল্পই ছিল, তথাপি তিনি সকলকে স্তম্ভিত

করিয়াছিলেন। যদি আপনার ন্যায় কেউ যান তো ইংলণ্ড তোলপাড় হইয়া যাইতে পারে, আমেরিকার কা কথা। দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম প্রচার করিলে আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এক মহান তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এ মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী ও উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনও নারীর এ সাহস হইবে না? প্রভু জানেন। ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড—আমরা ধর্মবলে অধিকার করিব, জয় করিব—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। এ দুর্দান্ত অসুরের হস্ত হইতে কি সভাসমিতি দ্বারা উদ্ধার হয়? অসুরকে দেবতা করিতে হইবে। আমি দীন ভিক্ষুক পরিব্রাজক কি করিতে পারি? আমি একা, অসহায়! আপনাদের ধন-বল, বুদ্ধি-বল, বিদ্যা-বল—আপনারা এ সুযোগ ত্যাগ করিবেন কি? এই এখন মহামন্ত্র—ইংলণ্ড বিজয়, ইওরোপ বিজয়, আমেরিকা বিজয়! তাহাতেই দেশের কল্যাণ। Expansion is the sign of life and we must spread the world over with our spiritual ideals.[১] হায় হায়! শরীর ক্ষুদ্র জিনিস, তায় বাঙালীর শরীর; এই পরিশ্রমেই অতি কঠিন প্রাণহর ব্যাধি আক্রমণ করিল! কিন্তু আশা এই—'উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা, কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।[২]

জীবহত্যা পাপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তবে যতদিন রাসায়নিক উন্নতির দ্বারা উদ্ভিজ্জাদি মনুষ্যশরীরের উপযোগী খাদ্য না হয়, ততদিন মাংসভোজন ভিন্ন উপায় নাই। যতদিন মনুষ্যকে আধুনিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া রজোগুণের ক্রিয়া করিতে হইবে, ততদিন মাংসাদন বিনা উপায় নাই। মহারাজ অশোক তরবারির দ্বারা দশ-বিশ লক্ষ জানোয়ারের প্রাণ বাঁচাইলেন বটে, কিন্তু হাজার বৎসরের দাসত্ব কি তদপেক্ষা আরও ভয়ানক নহে? দু-দশটা ছাগলের প্রাণনাশ বা আমার [অর্থাৎ নিজের] স্ত্রী-কন্যার মর্যাদা রাখিতে অক্ষমতা ও আমার বালকবালিকার মুখের গ্রাস পরের হাত হইতে রক্ষা করিতে অক্ষমতা, এ কয়েকটির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর পাপ? যাঁহারা উচ্চশ্রেণীর, এবং শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংগ্রহ করেন না, তাঁহারা বরং [মাংসাদি] না খান; যাহাদের দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া

১। বিস্তারই জীবনের চিহ্ন, আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শ লইয়া আমাদিগকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে হইবে।

২। আমার সমানধর্মা অন্য কোন ব্যক্তি আছেন বা উৎপন্ন হইবেন; কারণ কালের অন্ত নাই এবং পৃথিবীও বিপুলা। —'মালতী-মাধব', ভবভূতি।

অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে, বলপূর্বক তাহাদিগকে নিরামিষাশী করা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা-বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য কি করিতে পারে, জাপান তাহার নিদর্শন। সর্বশক্তিমতী বিশ্বেশ্বরী আপনার হৃদয়ে অবতীর্ণা হউন।

হার-জিত সব কাজেই আছে; কিন্তু না লড়েই হারব?

আমি চিরকাল বীরের মতো চলে এসেছি—আমার কাজ বিদ্যুতের মতো শীঘ্র আর বজ্রের মতো অটল চাই। আমি ঐ রকমই মরব। সেইজন্য আমার কাজটি করে দিও—হারা-জিতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। আমি লড়ায়ে কখনো পেছপাও হইনি; এখন কি ... হবো? হার-জিত সকল কাজেই আছে; তবে আমার বিশ্বাস যে, কাপুরুষ মরে নিশ্চিত কৃমিকীট হয়ে জন্মায়। যুগ যুগ তপস্যা করলেও কাপুরুষের উদ্ধার নেই—আমায় কি শেষে কৃমি হয়ে জন্মাতে হবে? ...আমার চোখে এ সংসার খেলামাত্র—চিরকাল তাই থাকবে। এর মান-অপমান দু-টাকা লাভ-লোকসান নিয়ে কি ছমাস ভাবতে হবে? ...আমি কাজের মানুষ! খালি পরামর্শ হচ্ছে—ইনি পরামর্শ দিচ্ছেন, উনি দিচ্ছেন; ইনি ভয় দেখাচ্ছেন, তো উনি ডর! আমার চোখে এ জীবনটা এমন কিছু মিষ্টি নয় যে, অত ভয়-ডর করে হুঁশিয়ার হয়ে বাঁচতে হবে। টাকা, জীবন, বন্ধু-বান্ধব, মানুষের ভালবাসা, আমি—সব অত সিদ্ধি নিশ্চিত করে যে কাজ করতে চায়, অত ভয় যদি করতে হয় তো গুরুদেব যা বলতেন যে, 'কাক বড় স্যায়না—' তার তাই হয়। আর যাই হোক, এ-সব টাকা-কড়ি, মঠ-মড়ি, প্রচার-ফ্রচার কি জন্য? সমস্ত জীবনের এক উদ্দেশ্য—শিক্ষা। তা ছাড়া ধন-বাড়ি স্ত্রী-পুরুষ প্রয়োজন কি?

এজন্য টাকা গেল, কি হার হলো—আমি অত বুঝতে পারি না বা পারব না। লড়াই করলুম কোমর বেঁধে—এ আমি খুব বুঝি; আর যে বলে 'কুছ পরোয়া নেই, ওরা বাহাদুর, আমি সঙ্গেই আছি' ... তাকে বুঝি, সে বীরকে বুঝি, সে দেবতাকে বুঝি। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোটি কোটি নমস্কার; তারাই জগৎপাবন, তারাই সংসারের উদ্ধারকর্তা! আর যেগুলো খালি 'বাপ রে এগিও না, ওই ভয়, ওই ভয়'—ডিস্‌পেপ্‌টিকগুলো—প্রায়ই ভয়তরাসে। তবে আমার মায়ের কৃপায় মনে এত জোর যে, ঘোর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কখনো আমায় কাপুরুষ করতে পারবে না। কাপুরুষদের আর কি বলব, কিছুই বলবার নাই। কিন্তু যত বীর এ জগতে

বড় কাজ করতে নিষ্ফল হয়েছেন, যাঁরা কখনো কোন কাজ থেকে হঠেননি, যে সকল বীর ভয় আর অহঙ্কারবশে হুকুম অগ্রাহ্য করেননি, তাঁরা যেন আমায় চরণে স্থান দেন। আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মিন্‌মিনে ভিন্‌ভিনে, ছেঁড়া ন্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক। মা জগদম্বে, হে গুরুদেব! তুমি চিরকাল বলতে, 'এ বীর!'—আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়। এই আমার প্রার্থনা, হে ভাই! ... 'উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা'—এই ঠাকুরের দাসানুদাসের মধ্যে কেউ না কেউ উঠবে আমার মতো, যে আমায় বুঝবে।

'জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন; শিয়রে শমন, ...তাহা না ডরাক তোমা'—যা কখনো করিনি, রণে পৃষ্ঠ দিইনি, আজ কি...তাই হবে? ...হারবার ভয়ে লড়াই থেকে হঠে আসব? হার তো অঙ্গের আভরণ; কিন্তু না লড়েই হারব?

তারা! মা! ...একটা তাল ধরবার মানুষ নেই; আবার মনে মনে খুব অহংকার, 'আমরা সব বুঝি'। ... আমি এখন চললাম, সব...তোমাদের রইল। মা আবার মানুষ দেন—যাদের ছাতিতে সাহস, হাতে বল, চোখে আগুন জ্বলে, যারা জগদম্বার ছেলে—এমন একজনও যদি দেন, তবে কাজ করব, তবে আবার আসব, নইলে জানলুম মায়ের ইচ্ছা এই পর্যন্ত। আমার এখন 'ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে', আমি চাই তড়িঘড়ি কাজ, নির্ভীক হৃদয়।

আমি তোমাদের সকলকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি—মা যেন মহাশক্তিরূপে তোমাদের মধ্যে আসেন, 'অভয়প্রতিষ্ঠং' অভয় যেন তোমাদের করেন। আমি জীবনে এই দেখলাম, যে সদা আত্ম-সাবধান করে, সে পদে পদে বিপদে পড়ে। যে মানের ভয়ে মরে, সে অপমানই পায়। যে সদা লোকসানের ভয় করে, সে সর্বদা খোয়ায়। ...তোমাদের সব কল্যাণ হোক!

ভবিষ্যৎ ভারত প্রাচীন ভারতের চেয়ে অনেক বড় হবে

এই যে দেশময় একটা হুজুক উঠিয়াছে, ইহার আশ্রয়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়। অর্থাৎ স্থানে স্থানে branch (শাখা) স্থাপন করিবার প্রযত্ন কর। ফাঁকা আওয়াজ না হয়। মদ্রাজবাসীদের সহিত যোগদান করিয়া স্থানে স্থানে সভা প্রভৃতি স্থাপন করিতে হইবে। যে খবরের কাগজ বাহির হইবার কথা হইতেছিল, তাহার কি হইল? খবরের কাগজ চালাইবার তোমার ভাবনা কি আমরা জানি না; এখন

লোক যে অল্প। চিঠি লিখে, ইত্যাদি করে সকলের ঘাড়ে গতিয়ে দাও; তারপর গড় গড় করে চলে যাবে। বাহাদুরি দেখাও দেখি। দাদা, মুক্তি নাই বা হলো, দু'চার বার নরককুণ্ডে গেলেই বা। এ কথা কি মিথ্যে?—

মনসি বচসি কায়ে পুণ্যপীযূষপূর্ণঃ
ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ।
পরগুণপরমাণূং পর্বতীকৃত্য কেচিৎ
নিজহৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ।।[১]

নাই বা হলো তোমাদের মুক্তি। কি ছেলেমানষি কথা! রাম রাম! আবার 'নেই নেই' বললে সাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায় কি না? ও কোন্ দিশী বিনয়—'আমি কিছু জানি না, আমি কিছুই নই'—ও কোন্ দিশী বৈরাগ্যি আর বিনয় হে বাপ! ও রকম 'দীনাহীনা' ভাবকে দূর করে দিতে হবে! আমি জানিনি তো কোন্ শালা জানে? তুমি জান না তো এতকাল করলে কি? ও-সব নাস্তিকের কথা, লক্ষ্মীছাড়ার বিনয়। আমরা সব করতে পারি, সব করব; যার ভাগ্যে আছে, সে আমাদের সঙ্গে হুহুঙ্কারে চলে আসবে, আর লক্ষ্মীছাড়াগুলো বেড়ালের মতো কোণে বসে মেউ মেউ করবে।

এক মহাপুরুষ লিখছেন, 'আর কেন? হুজুক খুব হলো, ঘরে ফিরে এস।' বেকুব; তোকে মরদ বলতুম, যদি একটা ঘর করে আমায় ডাকতে পারতিস। ও-সব আমি দশ বৎসর দেখে দেখে পাকা হয়ে গেছি। কথায় আর চিঁড়ে ভেজে না। যার মনে সাহস, হৃদয়ে ভালবাসা আছে, সে আমার সঙ্গে আসুক; বাকি কাউকে আমি চাই না, মার কৃপায় আমি একা এক লাখ আছি—বিশ লাখ হব। আমার দেশে যাওয়া অনিশ্চিত। সেখানেও ঘোরা, এখানেও ঘোরা; তবে এখানে পণ্ডিতের সঙ্গ, সেখানে মূর্খের সঙ্গ—এই স্বর্গ-নরকের ভেদ। এদেশের লোকে এককাট্টা হয়ে কাজ করে, আর আমাদের সকল কাজ বৈরিগ্যি (অর্থাৎ কুঁড়েমি), হিংসা প্রভৃতির মধ্যে পড়ে চুরমার।

একটা Organized Society (সজ্ঘবদ্ধ সমিতি) চাই। শশী ঘরকন্না দেখুক, সান্যাল টাকাকড়ি বাজারপত্রের ভার নিক, শরৎ সেক্রেটারী হোক অর্থাৎ

১। কতকগুলি সাধু আছেন, যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পুণ্যরূপ অমৃতে পূর্ণ হইয়া, নানাপ্রকার উপকার করিয়া, ত্রিভুবনকে প্রীত করিয়া, পরের গুণ পরমাণুতুল্য অল্প হইলেও উহাকে পাহাড়ের মতো বাড়াইয়া নিজ হৃদয়ের বিকাশ সাধন করেন।

চিঠিপত্র সব লেখা ইত্যাদি। একটা ঠিকানা কর, মিছে হাঙ্গাম কি করছ—বুঝতে পারলে কি না? খবরের কাগজে ঢের হয়ে গেছে, এক্ষণে আর দরকার নাই। এক্ষণে তোমরা কিছু কর দিকি দেখি। যদি একটা মঠ বানাতে পারো, তবে বলি বাহাদুর, নইলে ঘোড়ার ডিম। মদ্রাজের লোকদের সঙ্গে যুক্তি করে কাজ করবে। তাদের কাজ করবার অনেক শক্তি আছে। এবারকার মহোৎসব এমনি হুজুক করে করবে যে, এমন আর কখনও হয় নাই। খাওয়া-দাওয়ার হুজুক যত কম হয়, ততই ভাল। দাঁড়া-প্রসাদ, মালসা-ভোগ যথেষ্ট।

আমি একটা ইংরেজীতে রামকৃষ্ণের জীবনী very short (অতি সংক্ষিপ্ত) লিখিয়া পাঠাইতেছি। সেটা ছাপাইয়া ও বঙ্গানুবাদ করিয়া মহোৎসবে বিক্রি করিবে, বিতরণ করিলে লোকে পড়ে না। কিঞ্চিৎ দাম চাই। খুব ধুমধামের সঙ্গে মহোৎসব করিবে। কিছু collection (চাঁদা) নেবে।

চৌরস বুদ্ধি চাই, তবে কাজ হয়। যে গ্রামে বা শহরে যাও, যেখানে দশজন লোক পরমহংসদেবকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, সেখানেই একটা সভা স্থাপন করবে। এত গ্রামে গ্রামে কি ভেরেণ্ডা ভাজলে নাকি? হরিসভা প্রভৃতিগুলোকে ধীরে ধীরে 'স্বাহা' করতে হবে। কি বলব তোদের? আর একটা ভূত যদি আমার মতো পেতুম! ঠাকুর কালে সব জুটিয়ে দেবেন। ...শক্তি থাকলেই বিকাশ দেখাতে হবে। ...মুক্তি-ভক্তির ভাব দূর করে দে। এই একমাত্র রাস্তা আছে দুনিয়ায়—পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ (পরোপকারের জন্যই সাধুদিগের জীবন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্যই তা উৎসর্গ করবেন)। তোমার ভাল করলেই আমার ভাল হয়, দোসরা আর উপায় নেই, একেবারেই নেই। 'হে ভগবান, হে ভগবান!' আরে ভগবান হেন করবেন, তেন করবেন—আর তুমি বসে বসে কি করবে? ...তুই ভগবান, আমি ভগবান, মানুষ ভগবান দুনিয়াতে সব করছে; আবার ভগবান কি গাছের উপর বসে আছেন? এই তো বুদ্ধির দৌড়, তারপর— ...যদি কল্যাণ চাস, তবে ওসব হিংসে ঝগড়া ছেড়ে দিয়ে কাজে লেগে যা। যারা তা করতে পারবে না, তাদের বিদায় করে দে।

বিমলা ...শশী সাণ্ডেলের লিখিত এক পুস্তক পাঠিয়েছেন এবং লিখেছেন যে, শশীবাবুর সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ—তাই জন্য তাঁর পুস্তকের যদি এ দেশে কেহ কেহ সহায়তা করে। দাদা, সে পুঁথি হলো বাঙলা ভাষায়—এদেশের লোক কি সাহায্য করবে? —পুঁথি পড়ে বিমলা অবগত হয়েছেন যে, এ দুনিয়াতে

যত লোক আছে, তারা সকলে অপবিত্র এবং তাদের প্রকৃতিতে আসলে ধর্ম হবার জো-টি নাই, কেবল ভারতবর্ষের একমুষ্টি ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন, তাঁদের ধর্ম হতে পারবে। আবার তাঁদের মধ্যে শশী (সাণ্ডেল) আর বিমলাচরণ—এঁরা হচ্ছেন চন্দ্রসূর্যস্বরূপ। সাবাস, কি ধর্মের জোর রে বাপ! বিশেষ বাঙলা দেশে ঐ ধর্মটা বড়ই সহজ। অমন সোজা রাস্তা তো আর নাই। তপ-জপের সার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি পবিত্র আর সব অপবিত্র! পৈশাচিক ধর্ম, রাক্ষসী ধর্ম, নারকী ধর্ম! যদি আমেরিকার লোকের ধর্ম হতে পারে না, যদি এদেশে ধর্ম প্রচার করা ঠিক নয়, তবে তাহাদের সাহায্য-গ্রহণে আবশ্যক কি? এদিকে অযাচিত বৃত্তির ধুম, আবার পুঁথিময় আক্ষেপ, আমায় কেউ কিছু দেয় না। বিমলা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যখন ভারতসুদ্ধ লোক শশী (সাণ্ডেল) আর বিমলার পদপ্রান্তে ধনরাশি ঢেলে দেয় না, তখন ভারতের সর্বনাশ উপস্থিত। কারণ, শশীবাবু সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অবগত আছেন এবং বিমলা তৎপাঠে নিশ্চিত অবগত হয়েছেন যে, তিনি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেহই পবিত্র নাই। এ রোগের ঔষধ কি? বলি, শশীবাবুকে মালাবারে যেতে বলো। সেখানকার রাজা সমস্ত প্রজার জমি ছিনিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের চরণার্পণ করেছেন, গ্রামে গ্রামে বড় বড় মঠ, চর্ব্য চূষ্য খানা, আবার নগদ। ...ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নাই—ভোগ সাঙ্গ হলেই স্নান; কেননা ব্রাহ্মণেতর জাতি অপবিত্র—অন্য সময় তাদের স্পর্শ করাও নাই। এক শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণবদমাশ দেশটা উৎসন্ন দিয়েছে। 'দেহি দেহি' চুরি-বদমাশি—এরা আবার ধর্মের প্রচারক! পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলে 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না'—আর কাজ তো ভারি—'আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তাহলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে?' '১৪ বার হাত-মাটি না করিলে ১৪ পুরুষ নরকে যায় কি ২৪ পুরুষ?'—এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন আজ দু-হাজার বৎসর ধরে। এদিকে 1/4 of the people are starving (সিকি ভাগ লোক না খেতে পেয়ে মরছে)। ৮ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বৎসরের পুরুষের বে দিয়ে মেয়ের মা-বাপ আহ্লাদে আটখানা। ...আবার ও কাজে মানা করলে বলেন, আমাদের ধর্ম যায়! ৮ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কোন দেশী ধর্ম?

বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাপার স্মরণ কর—'তদনন্তরং মহিষীং অশ্ব-সন্নিধৌ পাতয়েৎ' ইত্যাদি! আর হোতা পোতা ব্রহ্মা উদ্‌গাতা প্রভৃতিরা বেড়োল মাতাল

হয়ে কেলেঙ্কারি করত। বাবা, জানকী বনে গিয়েছিলেন, রাম একা অশ্বমেধ করলেন—শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম বাবা!

এ কথা সমস্ত ব্রাহ্মণেই আছে—সমস্ত টীকাকার স্বীকার করেছেন। না করবার জো-টি কি!

এ সকল কথা বলবার মানে এই—প্রাচীনকালে ঢের ভাল জিনিস ছিল, খারাপ জিনিসও ছিল। ভালগুলি রাখতে হবে, কিন্তু আসছে যে ভারত—Future India—Ancient India-র (ভবিষ্যৎ ভারত প্রাচীন ভারতের) অপেক্ষা অনেক বড় হবে। যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India (বর্তমান ভারত)—সত্যযুগের আবির্ভাব! আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

তাইতেই যখন তোমরা বলো, রামকৃষ্ণ অবতার, আবার তারপরই বলো, আমরা কিছুই জানি না, তখনই আমি বলি, liar (মিথ্যাবাদী), চোর, ঝুঠ বিলকুল। যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্য হন, তোমরাও সত্য। কিন্তু দেখাতে হবে। ...তোমাদের সকলের ভেতর মহাশক্তি আছে, নাস্তিকের ভেতর ঘোড়ার ডিম আছে। যারা আস্তিক, তারা বীর; তাদের মহাশক্তি বিকাশ হবে। দুনিয়া ভেসে যাবে—'দয়া দীন উপকার'—মানুষ ভগবান, নারায়ণ—আত্মায় স্ত্রী পুং নপুং ব্রহ্মক্ষত্রাদি ভেদ নাই—ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত নারায়ণ। কীট Less manifested (অল্প অভিব্যক্ত), ব্রহ্ম more manifested (অধিক অভিব্যক্ত)। যে-কোন কাজ জীবের ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট করবার সহায়তা করে, তাই ভাল। যে-কোন কাজে তার বাধা হয়, তাই মন্দ। আমাদের ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট করবার একমাত্র উপায়—অপরকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করা। প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকলেও সকলের সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাকেও অধিক, কাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হবে।

অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশ জনের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম। The poor, the down-trodden, the ignorant, let these be your God (দরিদ্র, পদদলিত, অজ্ঞ—ইহারাই তোমার ঈশ্বর হউক)।

মহা দঁক সামনে—সাবধান! ঐ দঁকে সকলে পড়ে মারা যায়—ঐ দঁক হচ্ছে যে—হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়—ছুঁৎমার্গে; আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, বস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে না কি? যারা এক টুকরা রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে! যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করিবে? ছুঁৎমার্গ is a form of mental disease (একপ্রকার মানসিক ব্যাধি), সাবধান! All expansion is life, all contraction is death. All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life. He who loves lives, he who is selfish is dying. Therefore love for love's sake, because it is only law of life, just you breathe to live. This is the secret of নিষ্কাম প্রেম, কর্ম & c. (সর্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম, সেখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা, সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধান। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত; যিনি স্বার্থপর, তিনি মরণোন্মুখ। অতএব ভালবাসার জন্য ভালবাস, কারণ প্রেমই জীবনের একমাত্র নীতি, বাঁচিয়া থাকার জন্য যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। ইহাই নিষ্কাম প্রেম, কর্ম প্রভৃতির রহস্য)।

শশীর (সাণ্ডেল) যদি কিছু উপকার করিতে পারো চেষ্টা করিবে। সে অতি উদার ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান, তবে সঙ্কীর্ণপ্রাণ। পরদুঃখকাতরতা সকলের ভাগ্যে হয় না। রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া। তোরা এখনও বুঝতে পারিসনি। শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ (কেহ কেহ আত্মার বিষয় শুনিয়াও ইঁহাকে জানিতে পারে না)। What the whole Hindu race has thought in ages he *lived* in one life. His life is the living commentary to the Vedas of all the nations. (সমগ্র হিন্দুজাতি যুগ যুগ ধরিয়া যে চিন্তা করিয়া আসিয়াছে, তিনি এক জীবনেই সেই সমুদয় ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সকল

জাতির শাস্ত্রসমূহের জীবন্ত ভাষ্য)। ক্রমশঃ লোকে বুঝবে—আমার পুরনো বোল—struggle, struggle up to light. Onward (প্রাণপণ সংগ্রাম করে আলোর দিকে অগ্রসর হও)।

নেতার লক্ষণ কি?

অনেকে অপরের নেতৃত্বে সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারে। সকলেই কিছু নেতা হয়ে জন্মায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই, যিনি শিশুর মতো অন্যের উপর নেতৃত্ব করেন। শিশুকে আপাততঃ অন্যের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হলেও সে-ই সমগ্র বাড়ির রাজা। অন্ততঃ আমরা ধারণা এই যে, এই হলো নেতৃত্বের মূল রহস্য। ...অনুভব অনেকেই করে সত্য, কিন্তু জনকয়েকেই মাত্র প্রকাশ করতে পারে। অন্যের প্রতি অন্তরের প্রেম, প্রশংসা ও সহানুভূতি প্রকাশ করার যে ক্ষমতা, তাই এক জনকে অপরের অপেক্ষা ভাবপ্রচারে অধিক সাফল্য দান করে।

বড় অসুবিধা এই ঃ আমি দেখতে পাই—অনেকে তাদের প্রায় সবটুকু ভালবাসাই আমাকে অর্পণ করে; কিন্তু প্রতিদানে কোন ব্যক্তিকে আমার তো সবটুকু দেওয়া চলে না; কারণ একদিনেই তাহলে সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। নিজের গণ্ডির বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত নয়—এমন লোকও আছে, যারা ঐরূপ প্রতিদানই চায়। কর্মের সাফল্যের জন্য যত বেশি সম্ভব লোকের উৎসাহপূর্ণ অনুরাগ আমার একান্ত প্রয়োজন; অথচ আমাকে সম্পূর্ণভাবে সব গণ্ডির বাইরে থাকতে হবে। নতুবা হিংসা ও কলহে সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। নেতা যিনি, তিনি থাকবেন ব্যক্তির গণ্ডির বাইরে। আমার বিশ্বাস—তুমি এ-কথা বুঝতে পারছ। আমি এ-কথা বলছি না যে, নেতা অপরের শ্রদ্ধাকে পশুর মতো নিজের কাজে লাগাবেন, আর মনে মনে হাসবেন। আমি যা বলতে চাই, তা আমার নিজের জীবনেই পরিস্ফুট; আমার ভালবাসা একান্তই আমার আপনার জিনিস, আবার প্রয়োজন হলে—বুদ্ধদেব যেমন বলতেন 'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়'—তেমনি আমি নিজহস্তেই আমার হৃদয় উৎপাটিত করতে পারি। এ প্রেমে উন্মত্ততা আছে, কিন্তু কোন বন্ধন নেই। প্রেমের প্রভাবে অচেতন জড়বস্তু চেতনে পরিবর্তিত হয়। বস্তুতঃ এই হলো আমাদের বেদান্তের সার কথা। একই সদ্বস্তু অজ্ঞানীর চক্ষে 'জড়' এবং জ্ঞানীর চক্ষে 'ভগবান' বলে প্রতিভাত হন এবং জড়ের মধ্যে যে চেতনের ক্রমিক পরিচয়লাভ—তাই হলো সভ্যতার ইতিহাস।

অজ্ঞানীরা নিরাকারকেও সাকাররূপে দেখে, জ্ঞানী সাকারেও নিরাকারের দর্শন পান। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দের মধ্যে আমরা শুধু এই শিক্ষাই পাচ্ছি। ...অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা কর্মের পক্ষে অনিষ্টকর। 'বজ্রের মতো দৃঢ় অথচ কুসুমের মতো কোমল'—এটিই হচ্ছে সার নীতি।

সবাইকে নিয়ে কাজ কর

তোমার বরাবর একটি বুঝিবার ভ্রম হয় এবং '—' এর প্রবল বুদ্ধির দোষে বা গুণে সেটি যায় না। সেটি এই যে, যখন আমি হিসাব-কিতাবের কথা বলি, তোমার মনে হয় যে, আমি তোমাদের অবিশ্বাস করছি। ...আমার কেবল ভয় এই যে, এখন তো এক-রকম খাড়া করা গেল। অতঃপর আমরা চলে গেলে যাতে কাজ চলে এবং বেড়ে যায়, তাহাই দিনরাত্র আমার চিন্তা। হাজারই theoretical knowledge (তাত্ত্বিক জ্ঞান) থাকুক—হাতে-হেতড়ে না করলে কোনও বিষয়ে শেখা যায় না। Election (নির্বাচন), টাকাকড়ির হিসাব এবং discussion (আলোচনা)-এর জন্য বারংবার আমি বলি, যাতে সকলে কাজের জন্য তৈয়ার হয়ে থাকে। একজন মরে গেলে অমনি একজন (দশজন if necessary—প্রয়োজন হলে) should be ready to take it up (কাজে লাগবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত)। দ্বিতীয় কথা—মানুষের interest (আগ্রহ) না থাকিলে কেউ খাটে না; সকলকে দেখানো উচিত যে, everyone has a share in the work and property, and a voice in the management (প্রত্যেকেরই কাজে ও সম্পত্তিতে অংশ আছে এবং কার্যধারা সম্বন্ধে মতপ্রকাশের ক্ষমতা আছে)—এই বেলা থেকে। Alternately (পর্যায়ক্রমে) প্রত্যেককেই responsible position (দায়িত্বপূর্ণ কাজ) দেবে with an eye to watch and control (নিয়ন্ত্রণের প্রতি দৃষ্টি রেখে), তবে লোক তৈয়ার হয় for business (কাজের জন্য)। এমন machine (যন্ত্র)-টি খাড়া কর যে, আপনি-আপনি চলে যায়, যে মরে বা যে বাঁচে। আমাদের ইণ্ডিয়ার ঐটি great defect (প্রধান দোষ), we cannot make a permanent organisation (আমরা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না), and the reason is because we never like to share power with others and never think of what will come after we are gone. (আর তার

কারণ এই যে, আমরা অপরের সঙ্গে কখনও ক্ষমতা ভাগ করে নিতে চাই না এবং আমাদের পরে কি হবে, তা কখনও ভাবি না)।

কাজের উদ্দেশ্য—মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলা

অখণ্ডানন্দ মহুলাতে অদ্ভুত কর্ম করছে বটে, কিন্তু কার্য-প্রণালী ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। মনে হয়, তারা একটা গ্রামেই তাদের শক্তিক্ষয় করছে, তাও কেবল চাল-বিতরণের কার্যে। এই চাল দিয়ে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ প্রচারকার্যও হচ্ছে—কই, এরূপ তো শুনতে পাচ্ছি না। জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।

আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানতঃ শিক্ষাদান—চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের জন্য শিক্ষা-বিস্তার। আমি সে-সম্বন্ধে তো কোন কথা শুনছি না—কেবল শুনছি, এতগুলি ভিক্ষুককে সাহায্য দেওয়া হয়েছে! ব্রহ্মানন্দকে বলো বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র খুলতে, যাতে আমাদের সামান্য সম্বলে যতদূর সম্ভব অধিক জায়গায় কাজ করা যায়। আরও মনে হচ্ছে, এ পর্যন্ত ঐ কার্যে ফল কিছু হয়নি; কারণ তাঁরা এখনও পর্যন্ত স্থানীয় লোকদের মধ্যে তেমন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারেননি, যাতে তারা দেশের লোকের শিক্ষার জন্য সভা-সমিতি স্থাপন করতে পারে এবং ঐ শিক্ষার ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হতে পারে, বিবাহের দিকে অস্বাভাবিক ঝোঁক না থাকে, এবং এইভাবে ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। দয়ায় লোকের হৃদয় খুলে যায়; কিন্তু সেই দ্বার দিয়ে তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ যাতে হয়, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

সব চেয়ে সহজ উপায় এইঃ একটা ছোট কুঁড়ে নিয়ে গুরু-মহারাজের মন্দির কর। গরীবরা সেখানে আসুক, তাদের সাহায্যও করা হোক, তারা সেখানে পূজা-আর্চাও করুক। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে 'কথা' হোক। ঐ কথার সাহায্যেই তোমরা লোককে যা কিছু শেখাতে ইচ্ছা কর, শেখাতে পারবে। ক্রমে ক্রমে তাদের নিজেদেরই ঐ বিষয়ে একটা আস্থা ও আগ্রহ বাড়তে থাকবে—তখন তারা নিজেরাই সেই মন্দিরের ভার নেবে, আর হতে পারে, কয়েক বৎসরের ভেতর ঐ ছোট মন্দিরটিই একটি প্রকাণ্ড আশ্রমে পরিণত হবে। যাঁরা দুর্ভিক্ষমোচন-কার্যে যাচ্ছেন, তাঁরা প্রথমে প্রত্যেক জেলার কেন্দ্রস্থলে একটা জায়গা নির্বাচন

করুন—এইরূপ একটি কুঁড়ে নিয়ে সেখানে ঠাকুরঘর স্থাপন করুন—যেখান থেকে আমাদের অল্প-সল্প কাজ আরম্ভ হতে পারে।

মনের মতো কাজ পেলে অতি মূর্খও করতে পারে। যে সকল কাজকেই মনের মতো করে নিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান। কোন কাজই ছোট নয়, এ সংসারে যাবতীয় বস্তু বটের বীজের মতো, সর্ষপের মতো ক্ষুদ্র দেখালেও অতি বৃহৎ বটগাছ তার মধ্যে। বুদ্ধিমান সেই, যে এটি দেখতে পায় এবং সকল কাজকেই মহৎ করে তোলে।

যাঁরা দুর্ভিক্ষমোচন করছেন, তাঁদের এটিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জুয়াচোরেরা যেন গরীবের প্রাপ্য নিয়ে যেতে না পারে। ভারতবর্ষ এমন অলস জুয়াচোরে পূর্ণ এবং দেখে আশ্চর্য হবে, তারা কখনও না খেয়ে মরে না—কিছু না কিছু খেতে পায়ই। ব্রহ্মানন্দকে বলো, যাঁরা দুর্ভিক্ষে কাজ করছেন, তাঁদের সকলকে এই কথা লিখতে ঃ যাতে কোন ফল নেই, এমন কিছুর জন্য টাকা খরচ করতে তাঁদের কখনই দেওয়া হবে না—আমরা চাই, যতদূর সম্ভব অল্প খরচে যত বেশী সম্ভব স্থায়ী সৎকার্যের প্রতিষ্ঠা।

এখন তোমরা বুঝতে পারছ, তোমাদের নূতন নূতন মৌলিক চিন্তার চেষ্টা করতে হবে—তা না হলে আমি মরে গেলেই গোটা কাজটা চুরমার হয়ে যাবে। এইরকম করতে পারো ঃ তোমরা সকলে মিলে একটা সভায় এই বিষয় আলোচনা কর, আমাদের হাতে যে অল্পস্বল্প সম্বল আছে, তা থেকে কি করে সবচেয়ে ভাল স্থায়ী কাজ হতে পারে। কিছুদিন আগে থেকে সকলকে এই বিষয়ে খবর দেওয়া হোক, সকলেই নিজের মতামত—বক্তব্য বলুক, সেইগুলি নিয়ে বিচার হোক, বাদ-প্রতিবাদ হোক, তারপর আমাকে তার একটা বিবরণ পাঠাও।

উপসংহারে বলি, তোমরা মনে রেখো, আমি আমার গুরুভাইদের চেয়ে আমার সন্তানদের নিকট বেশী আশা করি—আমি চাই, আমার সব ছেলেরা, আমি যত বড় হতে পারতাম, তার চেয়ে শতগুণ বড় হোক। তোমাদের প্রত্যেককেই এক একটা 'দানা' হতেই হবে—আমি বলছি,—অবশ্যই হতে হবে। আজ্ঞাবহতা, উদ্দেশ্যের উপর অনুরাগ ও সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকা—এই তিনটি যদি থাকে, কিছুতেই তোমাদের হটাতে পারবে না।

বিশ্বাস কর—তোমরা বড় বড় কাজ করার জন্য জন্মেছ

জেনে রেখো ভবিষ্যতে তোমায় অনেক বড় বড় কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি ভাল বোঝ, কতকগুলি বড় লোককে ধরে তাদের রাজি করিয়ে সমিতির কর্মকর্তারূপে তাদের নাম প্রকাশ করবে। আসল কাজ কিন্তু করতে হবে তোমাকে—তাদের নামে অনেক কাজ হবে। তোমার যদি সাংসারিক কাজকর্ম খুব বেশি থাকে এবং তার দরুন যদি এ-সব করবার তোমার সময় না থাকে, তবে জি.জি. সমিতির এই বৈষয়িক দিকটার ভার নিক—আর আমি আশা করি, পেট চালাবার জন্যে যাতে কলেজের কাজের ওপর তোমায় নির্ভর না করতে হয়, তার চেষ্টা করব। তাহলে তুমি নিজে উপোস না করে আর পরিবারদের উপোস না করিয়ে সর্বান্তঃকরণে এই কাজে নিযুক্ত হতে পারবে। কাজে লাগো, বৎস, কাজে লাগো। কাজের কঠিন ভাগটা অনেকটা সিধে হয়ে এসেছে। এখন প্রতি বৎসর কাজ গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাবে। আর তোমরা যদি কোনরকমে কাজটা চালিয়ে যেতে পারো, তাহলে আমি ভারতে ফিরে গেলে কাজের দ্রুত উন্নতি হতে থাকবে। তোমরা যে এতদূর করেছ, এই ভেবে খুব আনন্দ করো। যখন মনে নিরাশ ভাব আসবে, তখন ভেবে দেখো, এক বছরের ভেতর কত কাজ হয়েছে। আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি—এখন সমগ্র জগৎ আমাদের দিকে আশায় চেয়ে রয়েছে। শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎ আমাদের কাছ থেকে বড় বড় জিনিস আশা করছে। নির্বোধ মিশনরীরা, ম—ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ কেহই সত্য, প্রেম ও অকপটতার শক্তিকে বাধা দিতে পারবে না। তোমাদের কি মন মুখ এক হয়েছে? তোমরা কি মৃত্যুভয় পর্যন্ত তুচ্ছ করে নিঃস্বার্থভাবে থাকতে পারো? তোমাদের হৃদয়ে প্রেম আছে তো? যদি এইগুলি তোমাদের থাকে, তবে তোমাদের কোন কিছুকে—এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত ভয় করবার দরকার নেই। এগিয়ে যাও, বৎসগণ। সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে—উৎসুক নয়নে তার জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেবল ভারতেই সে জ্ঞানালোক আছে—ইন্দ্রজাল, মূক অভিনয় বা বুজরুকিতে নয়, আছে প্রকৃত ধর্মের মর্মকথায়, উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের মহিমময় উপদেশে। জগৎকে সেই শিক্ষার ভাগী করবার জন্যই প্রভু এই জাতটাকে নানা দুঃখদুর্বিপাকের মধ্য দিয়েও আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন সময় হয়েছে। হে বীরহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস

কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের 'ঘেউ ঘেউ' ডাকে ভয় পেও না—এমনকি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেও না—খাড়া হয়ে ওঠ, ওঠ, কাজ করো।

ঈর্ষা দাসসুলভ মনোবৃত্তি

হিংসারূপ পাপ দাসজাতির মধ্যেই স্বভাবতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে এবং উহাই তাহাদিগকে হীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া রাখে। এদেশে '—' রা বক্তৃতা করিয়া অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিল এবং কিছু সাফল্য লাভ যে করে নাই—এমন নহে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর সাফল্য আমি লাভ করিয়াছিলাম; আমি কোন প্রকারে তাদের বিঘ্নস্বরূপ হই নাই। তবে কি কারণে আমার সাফল্য অধিক হইয়াছিল? কারণ উহাই ছিল ভগবানের অভিপ্রায়।

এদেশে কেহ যদি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তবে সকলেই তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আর ভারতবর্ষে কাল যদি কোন একটি পত্রিকায় আপনি আমার প্রশংসা করিয়া এক ছত্র কিছু লেখেন, তবে পরদিন দেশসুদ্ধ সকলে আমার বিপক্ষে দাঁড়াইবে। ইহার হেতু কি? হেতু—দাসসুলভ মনোবৃত্তি। নিজেদের মধ্যে কেহ সাধারণ স্তর হইতে একটু মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে, ইহা তাহাদের পক্ষে অসহ্য। এদেশের মুক্তিকামী, স্বাবলম্বী ও ভ্রাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ জনগণের সহিত আমাদের দেশের অপদার্থ লোকগুলির কি আপনি তুলনা করিতে চান? আমাদের সহিত যাহাদের নিকটতম সাদৃশ্য আছে, তাহারা এদেশের সদ্যোদাসত্বমুক্ত নিগ্রোগণ।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে প্রায় দুই কোটি নিগ্রো আর মুষ্টিমেয় কয়েকটি শ্বেত-আমেরিকান বাস করে; অথচ এই শ্বেতকায় কয়েকজনই নিগ্রোদিগকে দাবাইয়া রাখিয়াছেন।

আইন অনুসারে সব ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই দাসজাতির মুক্তির জন্য আমেরিকানরা ভাইয়ে ভাইয়ে এক নৃশংস যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। সেই একই দোষ—হিংসা এখানেও রহিয়াছে। একজন নিগ্রো আর একজনের প্রশংসা কিংবা উন্নতি সহ্য করিতে পারে না; অবিলম্বে তাহাকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য আমেরিকানদিগের সহিত যোগ দেয়। ভারতবর্ষের বাহিরে না আসিলে এ বিষয়ে সম্যক ধারণা হওয়া সম্ভব নহে।

যাহাদের প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি আছে, তাহাদের পক্ষে জগৎকে এইভাবে চলিতে দেওয়া ঠিক বটে; কিন্তু যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হইয়া এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের কথা একটিবার চিন্তা করিবার অবসর পায় না—তাহাদিগকে আমি 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া অভিহিত করি।

কোথায় ইতিহাসের কোন্ যুগে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত ও ধর্মধ্বজিগণ দীনদুঃখীর জন্য চিন্তা করিয়াছে?—তাহাদের ক্ষমতার জীবনীশক্তি ইহাদের নিষ্পেষণ হইতেই উদ্ভূত!

কিন্তু প্রভু মহান। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, এ অন্যায়ের সমুচিত ফলও ফলিয়াছে। যাহারা দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়াছে, উহাদের অর্জিত অর্থে নিজেরা শিক্ষা লাভ করিয়াছে, এমনকি, যাহাদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তির সৌধ দরিদ্রের দুঃখদৈন্যের উপরই নির্মিত—কালচক্রের আবর্তনে তাহাদেরই হাজার হাজার লোক দাসরূপে বিক্রীত হইয়াছে; তাহাদের স্ত্রীকন্যার মর্যাদা নষ্ট হইয়াছে এবং বিষয়-সম্পত্তি সবই লুণ্ঠিত হইয়াছে। বিগত সহস্র বৎসর যাবৎ ইহাই চলিয়া আসিতেছে। আর ইহার পশ্চাতে কি কোন কারণ নাই বলিয়া আপনি মনে করেন?

ভারতবর্ষে দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশি কেন? এ কথা বলা মূর্খতা যে, তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল। ...বস্তুতঃ জমিদার ও পুরোহিতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্যই উহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেইজন্য বাংলাদেশে, যেখানে জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য, সেখানে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরই সংখ্যা বেশি।

এই নির্যাতিত ও অধঃপতিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর উন্নতির কথা কে চিন্তা করে? কয়েক হাজার ডিগ্রীধারী ব্যক্তি দ্বারা একটি জাতি গঠিত হয় না, অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনীও একটি জাতি নহে। আমাদের সুযোগ-সুবিধা খুব বেশী নাই—এ-কথা অবশ্য সত্য, কিন্তু যেটুকু আছে, তাহা ত্রিশ কোটি নরনারীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে—এমনকি বিলাসিতার পক্ষেও যথেষ্ট।

আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জনই অশিক্ষিত, অথচ কে তাহাদের বিষয় চিন্তা করে? —এ সকল বাবুর দল কিংবা তথাকথিত দেশহিতৈষীর দল কি?

এ-সকল সত্ত্বেও আমি বলি যে, ভগবান অবশ্যই একজন আছেন এবং এ-কথা পরিহাসের বিষয় নহে। তিনিই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; এবং যদিও আমি জানি যে, দাসজাতি তাহার স্বভাবদোষে যথার্থ হিতকারীকেই দংশন করিয়া থাকে, তথাপি ইহাদেরই জন্য আমি প্রার্থনা করি এবং আমার সহিত আপনিও প্রার্থনা করুন। যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু মহৎ, তাহার প্রতি আপনি যথার্থ সহানুভূতিসম্পন্ন। আপনাকে জানিয়া অন্ততঃ এমন একজনকে জানিয়াছি বলিয়া আমি মনে করি, যাঁহার মধ্যে সারবস্তু আছে, যাঁহার প্রকৃতি উদার এবং যিনি অন্তরে বাহিরে অকপট। তাই আমার সহিত 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—এই প্রার্থনায় যোগ দিতে আমি আপনাকে আহ্বান করি।

লোকে কি বলিল—সেদিকে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। আমার ভগবানকে, আমার ধর্মকে, আমার দেশকে—সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষুককে আমি ভালবাসি। নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি ভালবাসি; তাহাদের বেদনা অন্তরে অনুভব করি, কত তীব্রভাবে অনুভব করি, তাহা প্রভুই জানেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাইবেন। মানুষের স্তুতি নিন্দায় আমি দৃক্‌পাতও করি না, তাহাদের অধিকাংশকেই অজ্ঞ কলরবকারী শিশুর মতো মনে করি। সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার ঠিক মর্মকথাটি ইহারা কখনও বুঝিতে পারে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে আমার সে অন্তর্দৃষ্টি আছে।

মুষ্টিমেয় সহকর্মীদের লইয়া এখন আমি কাজ করিতে চেষ্টা করিতেছি, আর উহাদের প্রত্যেকে আমারই মতো দরিদ্র ভিক্ষুক। তাহাদিগকে আপনি দেখিয়াছেন। প্রভুর কাজ চিরদিন দীন-দরিদ্রগণই সম্পন্ন করিয়াছে। আশীর্বাদ করিবেন যেন ঈশ্বরের প্রতি, গুরুর প্রতি এবং নিজের প্রতি আমার বিশ্বাস অটুট থাকে।

প্রেম এবং সহানুভূতিই একমাত্র পন্থা। ভালবাসাই একমাত্র উপাসনা।

আমার দৃঢ় ধারণা—কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া বাঁচিতে পারে না। আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা বা নীতি (policy)-সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া এইরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে, যেখানেই কোন জাতি আপনাকে পৃথক রাখিয়াছে, সেখানেই তাহার পক্ষে ফল অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে।

আমার মনে হয়, ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া। প্রাচীনকালে এই আচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুরা যেন চতুষ্পার্শবর্তী বৌদ্ধদের সংস্পর্শে না আসে। ইহার ভিত্তি—অপরের প্রতি ঘৃণা।

প্রাচীন বা আধুনিক তার্কিকগণ মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া যতই ইহা ঢাকিবার চেষ্টা করুন না কেন, অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না। ধর্মনীতির এই অব্যর্থ নিয়মের জাজ্বল্যমান প্রমাণস্বরূপ—ইহার অনিবার্য ফল এই হইল যে, যাহারা একদিন প্রাচীন জাতিসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে সমুদয় জাতির উপহাস ও ঘৃণার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদেরই পূর্বপুরুষগণ যে নিয়ম প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমরাই সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার দৃষ্টান্তস্থল হইয়া রহিয়াছি।

আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম; ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং পরিবর্তে অপরে যাহা কিছু দেয়, তাহাই গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রসারণই জীবন–সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দ্বেষই মৃত্যু। আমরা যেদিন হইতে অপর জাতিসকলকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলাম, সেইদিন হইতে আমাদের ধ্বংস আরম্ভ হইল; আর যতদিন না আমরা আবার সম্প্রসারণশীল হইতেছি, ততদিন কিছুই আমাদের বিনাশ আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে পৃথিবীর সকল জাতির সহিত মিশিতে হইবে। আর শত শত কুসংস্কারাবিষ্ট ও স্বার্থপর ব্যক্তি (প্রবাদবাক্যের কুকুর যেমন গরুর জাবপাত্রে শুইয়া থাকিয়া, নিজেও তাহা খায় না অথচ গরুরও খাইবার ব্যাঘাত উৎপাদন করে, ইহারাও সেইরূপ) অপেক্ষা প্রত্যেক হিন্দু, যিনি বিদেশে ভ্রমণ করিতে যান, তিনি স্বদেশের অধিকতর কল্যাণসাধন করেন। পাশ্চাত্য জাতিগণ জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন, সেগুলি চরিত্ররূপ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন না আমরা এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিতেছি, ততদিন এ-জাতি বা ও-জাতির বিরুদ্ধে বিরক্তিপ্রকাশ ও চিৎকার করা বৃথা।

যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয়ং স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য? আসুন, আমরা বৃথা চিৎকারে শক্তিক্ষয় না করিয়া ধীরতার সহিত

মনুষ্যোচিতভাবে কার্যে লাগিয়া যাই। আর আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, কেহ কিছু পাইবার ঠিক ঠিক উপযুক্ত হইলে জগতের কোন শক্তিই তাহাকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। আমাদের জাতীয় জীবন অতীতকালে মহৎ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবান্বিত। শঙ্কর আমাদিগকে পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ে অবিচলিত রাখুন।

স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত

এ পর্যন্ত কোন বিঘ্ন না হইয়া বরং আমাদের কার্যে উন্নতিই হইয়াছে, ইহাতে আমি পরম আনন্দিত। যে-কোনরূপেই হউক, সঙ্ঘের যাহাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হইতে পারে, তাহা করিতেই হইবে; আর আমরা ইহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব—নিশ্চয়ই। 'না' বলিলে চলিবে না। আর কিছুরই আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম, সরলতা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ বিস্তার; বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই জীবনের একমাত্র গতিনিয়ামক; স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ। দেহাবসানে কিছুই থাকে না, এ-কথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু।

পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বই জন নরপশুই মৃত, প্রেততুল্য, কারণ হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত ছাড়া আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা তোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘুরিতে থাকুক, তোমাদের পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হউক। তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ, অনন্ত শক্তি আসিবে। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল—এগিয়ে যাও, এখনও বলিতেছি, এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দিকে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পাই নাই, তখনও বলিয়াছি—এগিয়ে যাও। এখন একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে, এখনও বলিতেছি—এগিয়ে যাও। বৎস, ভয় পাইও না। উপরে তারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া

ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে—অল্পক্ষণের মধ্যে, দেখিবে, সবই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

এক্ষণে আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই—স্বাধীনতা ব্যতীত কোনরূপ উন্নতিই সম্ভব নহে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, ফলে আমরা এই অপূর্ব ধর্ম পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি কঠিন শৃঙ্খল পরাইলেন। এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের সমাজ ভয়াবহ, পৈশাচিক। পাশ্চাত্যদেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছে—তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ। আবার অপর দিকে তাহাদের ধর্ম কিরূপ, সেদিকেও দৃষ্টিপাত করিও।

স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তাহার আহার পোশাক বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন—তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কাহারও অনিষ্ট না করে।

আমরা নির্বোধের মতো জড় সভ্যতার বিরুদ্ধে চিৎকার করিতেছি। না করিবই বা কেন? হাত বাড়াইয়া না পাইলে 'আঙ্গুর টক' বলিব না তো কি! ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং না খাইয়া মরিতে হইবে? একজন লোকও কেন না খাইয়া মরিবে? মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে জয় করিল—এ ঘটনা সম্ভব হইল কেন? বাহ্য সভ্যতা সম্বন্ধে হিন্দুর অজ্ঞতাই ইহার কারণ। বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।

অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর

পৌরোহিত্যরূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে। আরও খাদ্য, আরও সুযোগ প্রয়োজন। আমাদের নির্বোধ যুবকগণ ইংরেজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতা লাভের জন্য সভাসমিতি করিয়া থাকে—ইহাতে ইংরেজরা হাসে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে। দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য। তাই বলি, এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও অনাচারের মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেল, দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া ইওরোপের সমাজের মতো একটি সমাজ গড়িতে পারো? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর এরূপ হইবেই হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করিবার প্রধান উপায়—মধ্যভারতে একটি উপনিবেশ স্থাপন। যাহারা তোমাদের ভাব মানিয়া চলিবে, কেবল তাহাদের সেখানে রাখা হইবে। তারপর এই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সেই ভাব বিস্তার করো। অবশ্য ইহাতে টাকার দরকার, কিন্তু এ টাকা আসিবে। ইতোমধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি করিয়া সমগ্র ভারতে তাহার শাখা স্থাপন করিয়া যাও। এখন কেবল ধর্মভিত্তিতে এই সমিতি স্থাপন কর; কোনরূপ সামাজিক সংস্কারের কথা এখন প্রচার করিও না। কেবলমাত্র এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, অজ্ঞ লোকদিগের কুসংস্কার যেন প্রশ্রয় না পায়। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি প্রাচীন নামের মধ্য দিয়া এ-সকল সত্য প্রচারিত হইলে লোকে সহজে গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ সঙ্গে নগরসংকীর্তন প্রভৃতিও বন্দোবস্ত করো।

মনে কর, প্রথম সমিতি খুলিবার সময় একটি মহোৎসব করিলে। নিশান প্রভৃতি লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া নগরসংকীর্তন হইল, বক্তৃতাদি হইল। তারপর প্রতি সপ্তাহে এক বা ততোধিক বার সমিতির অধিবেশন হউক। নিজের ভিতর উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করো, আর চারিদিকে বিস্তার করিতে থাকো। উঠিয়া পড়িয়া কাজে লাগো। নেতৃত্ব করিবার সময় সেবকভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও; আর একজন গোপনে অপরের নিন্দা করিতেছে, তাহা শুনিও না। অনন্ত ধৈর্য ধরিয়া থাকো, সিদ্ধি তোমার করতলে। এইটুকু বুঝ যে, যেখানে যেখানে তোমরা কোন সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিয়াছ, সেইখানেই কাজ করিবার একটু সুবিধা পাইয়াছ। সেই সুবিধার সহায়তা লইয়া কাজ করো। কাজ করো, কাজ করো;

পরের হিতের জন্য কাজ করাই জীবনের লক্ষণ। আমি আয়ারকে পৃথক কোন পত্র লিখি নাই, কিন্তু অভিনন্দন-পত্রের যে উত্তর পাঠাইয়াছি, তাহাই বোধ হয় পর্যাপ্ত হইবে। তাঁহাকে ও অপরাপর বন্ধুগণকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইবে। তাঁহারা সকলেই মহাশয় ব্যক্তি। একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে : আমি তোমার নিকটেই আমার সমুদয় পত্র পাঠাই বলিয়া—অন্যান্য বন্ধুগণের নিকট—তুমি নিজে যেন একটা মস্ত লোক, এটা দেখাইতে যাইও না। আমি জানি, তুমি এত নির্বোধ হইতেই পারো না। তথাপি তোমাকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহাতেই সম্প্রদায় ভাঙিয়া যায়। আমি চাই, যেন আমাদের মধ্যে কোনরূপ কপটতা, কোনরূপ লুকোচুরি ভাব, কোনরূপ দুষ্টামি না থাকে। আমি বরাবরই প্রভুর উপর নির্ভর করিয়াছি, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল সত্যের উপর নির্ভর করিয়াছি। আমার বিবেকের উপর এই কলঙ্ক লইয়া যেন মরিতে না হয় যে, আমি নামের জন্য, এমনকি পরের উপকার করিবার জন্য লুকোচুরি খেলিয়াছি। এক বিন্দু দুর্নীতি, বদ মতলবের এক বিন্দু দাগ পর্যন্ত যেন না থাকে।

গুপ্ত বদমাশি, লুকানো জুয়াচুরি যেন কিছু আমাদের মধ্যে না থাকে; কিছুই লুকাইয়া করা হইবে না। কেহ যেন নিজেকে গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র মনে করিয়া অভিমানে স্ফীত না হন। এমনকি, আমাদের মধ্যে গুরুও কেহ থাকিবে না; গুরুগিরি চলিবে না। হে বীরহৃদয় বালকগণ, কার্যে অগ্রসর হও। টাকা থাক বা না থাক, মানুষের সহায়তা পাও আর নাই পাও, তোমার তো প্রেম আছে? ভগবান তো তোমার সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

সাবধান! আমাদের মধ্যে যাহাতে কিছুমাত্র অসত্য প্রবেশ না করে। সত্যকে ধরিয়া থাকো, আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব। হইতে পারে বিলম্বে, কিন্তু নিশ্চিত কৃতকার্য হইব, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কাজ করিয়া যাও। মনে কর, আমি জীবিত নাই। এই মনে করিয়া কাজে লাগো, যেন তোমাদের প্রত্যেকের উপর সমুদয় কাজের ভার। ভাবী পঞ্চাশ শতাব্দী তোমাদের দিকে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। কাজ করিয়া যাও।

বজ্রদৃঢ় চরিত্র চাই

তোমাদের পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। মজুমদারের লীলা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত। গুরুমারা বিদ্যে করতে গেলে ঐ-রকম হয়। আমার অপরাধ বড় নাই। মজুমদার দশ বৎসর আগে এখানে এসেছিল—বড় খাতির ও সম্মান; এবার আমার পোয়াবারো। গুরুদেবের ইচ্ছা, আমি কি করিব? এতে চটে যাওয়া মজুমদারের ছেলেমানষি। যাক, উপেক্ষিতব্যং তদ্বচনং ভবৎসদৃশানাং মহাত্মনাম্। অপি কীটদংশনভীরুকাঃ বয়ং রামকৃষ্ণতনয়াঃ তদ্হৃদয়রুধিরপোষিতাঃ? 'অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং' ইত্যাদয়ঃ সংস্মৃত্য ক্ষন্তব্যোঽয়ং জাল্মঃ মজুমদারাখ্যঃ।[১] প্রভুর ইচ্ছা—এ দেশের লোকের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি প্রবোধিত হয়। মজুমদার ফজুমদারের কর্ম তাঁর গতি রোধ করে? আমার নামের আবশ্যক নাই—I want to be a voice without a form[২]। হরমোহন প্রভৃতি কাহারও আমাকে সমর্থন করিবার আবশ্যক নাই—কোঽহং তৎপাদপ্রসরং প্রতিরোদ্ধুং সমর্থয়িতুং বা, কে বান্যে হরমোহনাদয়ঃ? তথাপি মম হৃদয়কৃতজ্ঞতা তান্ প্রতি। 'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'—নৈষ প্রাপ্তবান্ তৎপদবীমিতি মত্বা করুণাদৃষ্ট্যা দ্রষ্টব্যোঽয়মিতি।[৩] প্রভুর ইচ্ছায় এখনও নামযশের ইচ্ছা হৃদয়ে আসে নাই, বোধ হয় আসিবেও না। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি এই যন্ত্র দ্বারা সহস্র সহস্র হৃদয়ে এই দূরদেশে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতেছেন। সহস্র সহস্র নরনারী এদেশে আমাকে অতিশয় স্নেহ প্রীতি ও ভক্তি করে, আর শত শত পাদ্রী ও গোঁড়া ক্রিশ্চান শয়তানের সহোদর মনে করে। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং,[৪] আমি তাঁহার কৃপায় আশ্চর্য! যে শহরে

১। তোমাদের ন্যায় মহাত্মাগণের তাঁহার কথা উপেক্ষা করা উচিত। আমরা রামকৃষ্ণতনয়, তাঁহার হৃদয়ের রক্ত দিয়া তিনি আমাদিগকে পুষ্ট করিয়াছেন, আমরা সামান্য পোকার কামড়ে ভয় পাইব? 'মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাত্মাগণের অসাধারণ ও যাহার কোন কারণ সহজে নির্দেশ করিতে পারা যায় না, এইরূপ আচরণের নিন্দা করিয়া থাকে।' (কুমারসম্ভব)—ইত্যাদি স্মরণ করিয়া এই মজুমদার নামক ব্যক্তিকে ক্ষমা করা উচিত।

২। আমি অমূর্ত (বা অশরীরী) বাণী হইতে চাই।

৩। তাঁহার প্রভাববিস্তারের গতিতে বাধা দিবার বা সাহায্য করিবার আমি কে? হরমোহন প্রভৃতিই বা কে? তথাপি তাহাদের প্রতি আমার হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 'যে অবস্থা লাভ হইলে লোক গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হয় না' (গীতা)—সেই অবস্থা এ ব্যক্তি এখনও লাভ করে নাই মনে করিয়া ইহার প্রতি সদয় দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

৪। বোবাকে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন ও খোঁড়াকে পর্বত লঙ্ঘন করিতে সমর্থ করে।

যাই, তোলপাড় হয়। এরা আমার নাম দিয়েছে—Cyclonic Hindu.[১] তাঁর ইচ্ছা মনে রাখিও— I am a voice without a from (আমি অমূর্ত বাণী)।

ইংলণ্ডে যাব কি যমলয়াণ্ডে, প্রভু জানেন। তিনি সব যোগাড় করে দেবেন। এদেশে একটা চুরুটের দাম এক টাকা, একবার ঠিকাগাড়ী চড়লে ৩ টাকা, একটা জামার দাম ১০০ টাকা। ৯ টাকা রোজ হোটেল—প্রভু সব যুগিয়ে দেন। এদেশের সব বড় বড় লোকের বাড়িতে যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছে। উত্তম খাওয়া-পরা সব আসছে—জয় প্রভু, আমি কিছু জানি না। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ'[২] 'বিগতভীঃ' হওয়া চাই। কাপুরুষে ভয় করে, আত্মসমর্পণ করে। কেহ যেন আমাকে সমর্থন করিতে অগ্রসর না হয়। মাদ্রাজের খবর সব আমি মধ্যে মধ্যে পাই ও রাজপুতানার। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়ে আমাকে অনেক ঠাট্টা করেছে—কার কথা কার মুখে দিয়ে! সব খবর পাচ্ছি। আর দাদা—এমন চক্ষু আছে, যা ৭০০০ ক্রোশ দূরে দেখে—এ কথা সত্য বটে। চুপে যেও, কালে কালে সব বেরুবে—যতটুকু তাঁর ইচ্ছা। তাঁর একটা কথাও মিথ্যে হয় না। দাদা, কুকুর-বেড়ালের ঝগড়া দেখে মানুষে কি দুঃখু করে? তেমনি সাধারণ মানুষের ঈর্ষা হিংসা গুঁতাগুঁতি দেখে তোমাদের মনে কোন ভাব হওয়া উচিত নয়। দাদা, আজ ছ-মাস থেকে বলছি যে, পর্দা হঠছে, সূর্যোদয় হচ্ছে। পর্দা উঠছে—উঠছে ধীরে ধীরে, Slow but sure (ধীরে কিন্তু নিশ্চিত), কালে প্রকাশ। তিনি জানেন—'মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা'। দাদা, এসব লিখিবার নহে, বলিবার নহে। হাল ছেড় না, টিপে ধরে থেক—পাকড় ঠিক বটে, তাতে আর ভুল নাই—তবে পারে যাওয়া আজ আর কাল—এই মাত্র। দাদা, leader (নেতা) কি বানাতে পারা যায়? Leader জন্মায়। বুঝতে পারলে কি না? লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ, হাজারো লোকের মন যোগানো। Jealousy, selfishness (ঈর্ষা, স্বার্থপরতা) আদপে থাকবে না—তবে leader, প্রথম by birth (জন্মগত), দ্বিতীয় unselfish (নিঃস্বার্থ), তবে leader, সব ঠিক হচ্ছে, সব ঠিক আসবে, তিনি ঠিক জাল ফেলছেন, ঠিক

১। ঝঞ্ঝাসদৃশ হিন্দু।

২। সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার কখনও জয় হয় না; সত্যবলেই দেবযানমার্গ লাভ হয়—(মুণ্ডকোপনিষদ)। বেদান্তমতে মৃত্যুর পর যে বিভিন্ন গতি হয়, তন্মধ্যে দেবযানের দ্বারা গতি শ্রেষ্ঠ গতি। অরণ্যে উপাসনা ও ভিক্ষাপরায়ণ নিষ্কাম সন্ন্যাসিগণেরই এই গতি হয়।

জাল গুটাচ্ছেন—বয়মনুসরামঃ, বয়মনুসরামঃ, প্রীতিঃ পরমসাধনম্[১] বুঝলে কি না? Love conquers in the long run[২], দিক হলে চলবে না—wait, wait (অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর); সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে।

তোমায় বলি ভায়া, যেমন চলছে চলতে দেও, তবে দেখো কোন form (বাহ্য অনুষ্ঠানপদ্ধতি) যেন necessary (একান্ত আবশ্যক) না হয়, unity in variety (বহুত্বে একত্ব)—সর্বজনীন ভাবের যেন কোনমতে ব্যাঘাত না হয়। Everything must be sacrificed, if necessary, for that one sentiment—universality.[৩] আমি মরি আর বাঁচি, আর দেশে যাই বা না যাই, তোমরা বিশেষ করে মনে রাখবে যে, সর্বজনীনতা—perfect acceptance, not tolerance only, we preach and pefrorm. Take care how you trample on the least rights of others.[৪] ঐ দিয়ে বড় বড় জাহাজ ডুবি হয়ে যায়। পূর্ণ ভক্তি গোঁড়ামি ছাড়া—এইটি দেখাতে হবে, মনে রেখো। তাঁর কৃপায় সব ঠিক চলবে। মঠ কেমন চলছে, উৎসব কেমন হলো, গোপাল—বুড়ো ও হুটকো কোথায় কেমন, গুপ্ত কোথায় কেমন—সব লিখবে। মাস্টার কি বলে? ঘোষজা কি বলে? রামদাদা ঠাণ্ডা ভাব পেয়েছে কি না? দাদা, সকলের ইচ্ছে যে leader (নেতা) হয়, কিন্তু সে যে জন্মায়—ঐটি বুঝতে না পারাতেই এত অনিষ্ট হয়। প্রভুর কৃপায় রামদাদা শীঘ্রই ঠাণ্ডা হবে ও বুঝতে পারবে। তাঁর কৃপা কাউকে ছাড়বে না। জি. সি. ঘোষ কি করছে?

আমাদের মাতৃকাগণ বেঁচে বর্তে আছে তো? গৌর-মা কোথা? এক হাজার গৌর-মার দরকার—ঐ noble stirring spirit (মহান ও উদ্দীপনাময় ভাব)। যোগেন-মা প্রভৃতি সকলে ভাল আছে বোধ হয়। মহিম চক্রবর্তী কি করছে? তার ওখানে যাওয়া-আসা করিবে। লোকটা ভাল। আমরা সকলকে চাই— It is not at all necessary that all should have the same faith in our

---

১। আমরা কেবল তাঁহার অনুসরণ করিব—প্রীতিই পরম সাধন।

২। আখেরে প্রেম জয়ী হইয়া থাকে।

৩। যদি প্রয়োজন হয়, তবে সেই একটি ভাব—'সর্বজনীনতা' রক্ষার জন্য সমস্তই ছাড়িতে হইবে।

৪। সকল ধর্মকে সত্য বলিয়া গ্রহণ, কেবল পরধর্মসহিষ্ণুতা নহে—ইহাই আমরা প্রচার করি এবং কার্যেও পরিণত করি। বিশেষ সাবধান, যেন অপরের ক্ষুদ্রতম অধিকারও পদদলিত করিও না।

Lord as we have, but we want to unite all the powers of goodness against all the powers of evil.[১] মহেন্দ্র মাস্টারকে request from me (আমার তরফ থেকে অনুরোধ কর)। He can do it (তিনি এটা করতে পারবেন)। আমাদের একটা বড় দোষ—সন্ন্যাসের গরিমা। ওটা প্রথম প্রথম দরকার ছিল, এখন আমরা পেকে গেছি, ওটার আবশ্যক একেবারেই নাই। বুঝতে পেরেছ? সন্ন্যাসী আর গৃহস্থে কোন ভেদ থাকবে না, তবে যথার্থ সন্ন্যাসী। সকলকে ডেকে বুঝিয়ে দেবে—মাস্টার, জি. সি. ঘোষ, রামদা, অতুল আর আর সকলকে নিমন্ত্রণ করে যে, ৫/৭টা ছোঁড়াতে মিলে, যাদের এক পয়সাও নাই, একটা কার্য আরম্ভ করলে—যা এখন এমন accelerated (ক্রমবর্ধমান) গতিতে বাড়তে চলল—এ হুজুক, কি প্রভুর ইচ্ছা? যদি প্রভুর ইচ্ছা, তবে তোমরা দলাদলি jealousy (ঈর্ষা) পরিত্যাগ করে united action (সমবেতভাবে কার্য) কর।

সকলে যদি একদিন এক মিনিট বোঝে যে, আমি বড় হবো বললেই বড় হওয়া যায় না, যাকে তিনি তোলেন সে উঠে, যাকে তিনি নীচে ফেলেন সে পড়ে যায়, তা হলে সকল ন্যাটা চুকে যায়। কিন্তু ঐ যে 'অহং'—ফাঁকা 'অহং'—তার আবার আঙ্গুল নাড়াবার শক্তি নাই, কিন্তু কাউকে উঠতে দেবে না—বললে কি চলে? ঐ jealousy (ঈর্ষা), ঐ absence of conjoined action (সংঘবদ্ধভাবে কার্য করিবার শক্তির অভাব) গোলামের জাতের nature (স্বভাব); কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করা উচিত। ঐ terrible jealousy characteristic (ভয়ানক চারিত্রিক বিশেষত্ব ঈর্ষা) আমাদের, বিশেষ বাঙ্গালীর। কারণ, we are the most worthless and superstitious and the most cowardly and lustful of all Hindus.[২] পাঁচটা দেশ দেখলে ঐটি বেশ করে বুঝতে পারবে। আমাদের সমাত্মা এই গুণে এদের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কাফ্রীরা—যদি তাদের মধ্যে একজনও বড় হয়, অমনি সবগুলোয় পড়ে তার পিছু লাগে—white (শ্বেতাঙ্গ)-দের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। আমরাও ঠিক ঐ রকম। গোলাম

১। আমাদের মতো সকলেরই যে ঠাকুরের উপর সমান বিশ্বাস থাকিবে, এমন কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমরা জগতের সমুদয় অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র শুভ শক্তি সমবেত করিতে চাই।

২। হিন্দুগণের ভিতর আমরাই সবচেয়ে অপদার্থ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কাপুরুষ ও কামুক।

কীটগুলো, এক পা নড়বার ক্ষমতা নাই—স্ত্রীর আঁচল ধরে তাস খেলে গুড়ুক ফুঁকে জীবনযাপন করে, আর যদি কেউ ঐগুলোর মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেঁউ কেঁউ করে তার পিছে লাগে—হরে হরে।

At any cost, any price, any sacrifice (ওর জন্য যতই ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হোক) ঐটি আমাদের ভিতরে না ঢোকে—আমরা দশজন হই, দু'জন হই do not care (কুছ পরোয়া নেই), কিন্তু ঐ কয়টা perfect characters (সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ চরিত্র) হওয়া চাই। আমাদের ভিতর যিনি পরস্পরের গুজুগুজু নিন্দা করবেন বা শুনবেন, তাকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। ঐ গুজুগুজু সকল নষ্টের গোড়া—বুঝতে পারছ কি? হাত ব্যথা হয়ে এল ...আর লিখতে পারি না। 'মাঙ্গনা ভালা না বাপ্‌সে যব্ রঘুবীর রাখে টেক্।' রঘুবীর টেক্ রাখবেন দাদা—সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো। বাঙ্গলা দেশে তাঁর নাম প্রচার হলো বা না হলো, তাতে আমার অণুমাত্র চেষ্টা নাই—ওগুলো কি মানুষ! রাজপুতানা, পাঞ্জাব, N.W. (উত্তর-পশ্চিম) প্রদেশ[১], মদ্রাজ—ঐসকল দেশে তাঁকে ছড়াতে হবে। রাজপুতানায় যেখানে 'রঘুকুলরীতি সদা চলি আঈ। প্রাণ জাঈ বরু বচন ন জাঈ।' —এখনও বাস করে।

প্রয়োজন—চিন্তাশীলতা ও চরিত্র

আমার ব্যক্তিগত মতামতের একটু আভাস দেওয়া দরকার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানব সমাজে ধর্মের অপূর্ব উচ্ছ্বাস মধ্যে মধ্যে উত্থিত হইয়া থাকে এবং তেমনি এক উচ্ছ্বাস বর্তমানেও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছে। প্রত্যেক উচ্ছ্বাসবেগ আবার বহু ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত বলিয়া বোধ হইলেও মূলতঃ তাহারা যে একই তত্ত্ব বা তত্ত্বসমষ্টি হইতে উদ্ভূত, তাহাও তাহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। বর্তমান সময়ে যে ধর্মভাব দিন দিন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের মধ্যেই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবাদ উহা হইতে উদ্ভূত হইতেছে, তাহারা সকলেই সেই এক অদ্বৈত-তত্ত্বের অনুভূতি ও অনুসন্ধানেই সচেষ্ট। জাগতিক, নৈতিক এবং আত্মিক সকল ক্ষেত্রেই এই একটি ভাব দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন মতবাদসমূহ ক্রমেই উদার হইতে উদারতর হইয়া সেই শাশ্বত অদ্বৈত-তত্ত্বের অভিমুখে অগ্রসর

১। বর্তমান U.P. (উত্তরপ্রদেশ)

হইতেছে। সুতরাং ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, বর্তমান যুগের যত ভাবান্দোলন আছে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেগুলি এক অপূর্ব ঐক্যমূলক দর্শন—অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিরূপ; আর মানব আজ পর্যন্ত যত প্রকার একত্ববাদের দর্শন আবিষ্কার করিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বোত্তম। আবার ইহাও সর্বদা দেখা যায় যে, প্রতিযুগে এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষের ফলে শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র মতবাদই টিকিয়া যায় এবং অন্য তরঙ্গগুলি উঠে শুধু উহারই অঙ্গে মিশিয়া গিয়া উহাকে একটি বিপুল ভাবতরঙ্গে পরিণত করিবার জন্য। তখন সেই প্রবল ভাবস্রোত সমাজের উপর দিয়া অপ্রতিহত বেগে বহিয়া যায়।

ভারতবর্ষে, আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে অর্থাৎ যাহাদের ইতিহাস আমি অবগত আছি, সেই সব দেশে বর্তমান সময়ে এইরূপ শত শত মতবাদের সংঘর্ষ চলিতেছে। ভারতবর্ষে দ্বৈতবাদ এখন ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে, কেবল অদ্বৈতবাদই সর্বক্ষেত্রে প্রতাপবান। আমেরিকাতেও বহু মতবাদের মধ্যে প্রাধান্যলাভের জন্য সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের সবগুলিই অল্প-বিস্তর অদ্বৈতবাদের প্রতিরূপ, আর যে ভাবপরম্পরা যত দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে, সেইগুলি অদ্বৈত বেদান্তের তত বেশি অনুরূপ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। আর আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, অন্য সবগুলিকে গ্রাস করিয়া ভবিষ্যতে একটি মতবাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবেই। কিন্তু সেটি কোন্‌টি? ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, যে অংশটি যোগ্যতম তাহাই শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে। আর নিষ্কলুষ চরিত্রের মতো অন্য কোন্ শক্তি মানুষকে যথার্থ যোগ্যতা-দানে সমর্থ? অনাগত ভবিষ্যতে অদ্বৈত বেদান্তই যে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারাই জয়লাভ করিবে, যাহারা জীবনে চরিত্রের চরম উৎকর্ষ দেখাইতে পারিবে; সে সম্প্রদায় কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে যে আসিবে, তাহা বিবেচ্য নহে।

আমার নিজ জীবনের একটু অভিজ্ঞতা জানাইতেছি। যখন আমার গুরুদেব দেহত্যাগ করিলেন, তখন আমরা দ্বাদশ জন অজ্ঞাত অখ্যাত কপর্দকহীন যুবক মাত্র ছিলাম। আর বহুসংখ্যক শক্তিশালী সঙ্ঘ আমাদিগকে পিষিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে আমরা এক অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছি, কেবল বাক-সর্বস্ব না হইয়া যথার্থ জীবনযাপনের জন্য একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বিরামহীন সাধনার অনুপ্রেরণা তাঁহার নিকট আমরা

লাভ করিয়াছিলাম। আর আজ সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাকে জানে এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পায়ে মাথা নত করে। তৎপ্রচারিত সত্যসমূহ আজ দাবানলের মতো দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দশ বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্মতিথি-উৎসবে এক শত ব্যক্তিকে একত্র করিতে পারি নাই, আর গত বৎসর পঞ্চাশ হাজার লোক তাঁহার জন্মতিথিতে সমবেত হইয়াছিল।

কেবল সংখ্যাধিক্য দ্বারাই কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না; অর্থ, ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য কিংবা বাক্‌চাতুরী—ইহাদের কোনটিরই বিশেষ কোন মূল্য নাই। পবিত্র, খাঁটি এবং প্রত্যক্ষানুভূতিসম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তিরাই জগতে সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যদি প্রত্যেক দেশে এইরূপ দশ-বারটি মাত্র সিংহবীর্যসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা নিজেদের সমুদয় মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, যাঁহারা অসীমের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের সমগ্র চিত্ত ব্রহ্মানুধ্যানে নিমগ্ন, অর্থ যশ ও ক্ষমতার স্পৃহামাত্রহীন—তবে এই কয়েকজন ব্যক্তিই সমগ্র জগৎ তোলপাড় করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ইহাই নিগূঢ় রহস্য। যোগপ্রবর্তক পতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'মানুষ যখন সমুদয় অলৌকিক যোগবিভূতির লোভ ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়, তখনই তাহার ধর্মমেঘ নামক সমাধি লাভ হয়।' সে অবস্থায়ই তাঁহার ভগবদ্দর্শন হয়, তিনি ভগবৎস্বরূপে স্থিত হন, এবং অপরকে তদ্রূপ হইতে সাহায্য করেন। শুধু এই বাণী দিকে দিকে প্রচার করিতে চাই। জগতে বহু মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ পুস্তকও লিখিত হইয়াছে; কিন্তু হায় সামান্যমাত্রও যদি কেহ অনুষ্ঠান করিত!

সমাজ ও সঙ্ঘের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, উহারা আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিবে। যেখানে হিংসার কোন বিষয় নাই, সেখানে হিংসা থাকিবে কিরূপে? আমাদের অনিষ্ট সাধন করিতে চায়, এইরূপ অসংখ্য লোক মিলিবে। কিন্তু ইহাতেই কি প্রমাণিত হয় না যে, সত্য আমাদেরই পক্ষে? আমি জীবনে যত বাধা পাইয়াছি, ততই আমার শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে; এক টুকরা রুটির জন্য আমি গৃহ হইতে গৃহান্তরে বিতাড়িত হইয়াছি; আবার রাজা-মহারাজগণ কর্তৃকও আমি বহুভাবে পূজিত এবং বহুবার নিমন্ত্রিত হইয়াছি। বিষয়ী লোক এবং পুরোহিতকুল—সমভাবে আমার উপর নিন্দাবর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার কি আসে যায়? ভগবান তাহাদের কল্যাণ করুন, তাহারাও আমার আত্মার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। বস্তুতঃ ইহারা সকলে আমাকে স্প্রিং বোর্ডেরই (spring board)

মতো সাহায্য করিয়াছে—ইহাদের প্রতিঘাতে আমার শক্তি উচ্চ হইতে উচ্চতর বিকাশ লাভ করিয়াছে।

বাক্‌সর্বস্ব ধর্মপ্রচারক দেখিয়া যে আমার ভয় পাইবার কিছুই নাই, তাহা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছি। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ কখনও কাহারও শত্রুতা করিতে পারেন না। 'বচনবাগীশ'রা বক্তৃতা করিতে থাকুক! তদপেক্ষা ভাল কিছু তাহারা জানে না। নাম, যশ ও কামিনী-কাঞ্চন লইয়া তাহারা বিভোর ও মত্ত থাকুক। আর আমরা যেন ধর্মোপলব্ধির, ব্রহ্মলাভের ও ব্রহ্ম হওয়ার জন্য দৃঢ়ব্রত হই। আমরা যেন মৃত্যু পর্যন্ত এবং জীবনের পর জীবন ব্যাপিয়া সত্যকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি। অন্যের কথায় আমরা যেন মোটেই কর্ণপাত না করি। সমগ্র জীবনের সাধনার ফলে যদি আমাদের মধ্যে একজনও জগতের কঠিন বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইতে পারে, তবেই আমাদের ব্রত উদ্‌যাপিত হইল।

আর একটি কথা। ভারতকে আমি সত্য সত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশতঃ লোকে যাহাদিগকে 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই 'নারায়ণের'ই সেবক। যে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে জলসেচন করে, সে কি প্রকারান্তরে সমস্ত বৃক্ষটিতেই জলসেচন করে না?

কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ কল্যাণের ভিত্তি একটিই আছে, সেটি—এইটুকু জানা যে, 'আমি ও আমার ভাই এক'। সর্বদেশে সর্বজাতির পক্ষেই এ কথা সমভাবে সত্য। আমি বলিতে চাই, প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্যই এ তত্ত্ব আরও শীঘ্র ধারণা করিতে পারিবে। কারণ এই চিন্তাসূত্রটির প্রণয়নে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি উৎপন্ন করিয়াই প্রাচ্যের সমুদয় ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষিত।

আমরা যেন নাম, যশ ও প্রভুত্ব-স্পৃহা বিসর্জন দিয়া কর্মে ব্রতী হই। আমরা যেন কাম, ক্রোধ ও লোভের বন্ধন হইতে মুক্ত হই। তাহা হইলেই আমরা সত্য বস্তু লাভ করিব।

শূদ্রযুগ আসছে

মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারিটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেকটির শাসনকালে রাষ্ট্র (State) দোষ-গুণ উভয়ই বর্তমান। পুরোহিত-শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে

ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকার রক্ষার জন্য চারদিকে বেড়া দেওয়া থাকে,—তাঁরা ছাড়া বিদ্যা শিখবার অধিকার কারও নেই, বিদ্যাদানেরও অধিকার কারও নেই। এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন।

ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদার নন। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক কৃষ্টির (culture) চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।

তারপর বৈশ্যশাসন-যুগ। এর ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্ত-শোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ! এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগে পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়!

সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সংস্কৃতির অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই কমে যাবে।

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ-যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব?

প্রত্যুত প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। সোনা অথবা রূপো—কোন্‌টির ভিত্তিতে দেশের মুদ্রা প্রচলিত হলে কি কি অসুবিধা ঘটে, তা আমি বিশেষ জানি না—(আর বড় একটা কেউ জানেন বলে মনে হয় না)। কিন্তু এটুকু আমি বেশ বুঝতে পারি যে, সোনার ভিত্তিতে সকল মূল্য ধার্য করার ফলে গরীবরা আরও গরীব এবং ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে। ব্রায়ান যথার্থই বলেছেন, 'আমরা এই সোনার ক্রুশে বিদ্ধ হতে নারাজ।' রূপার দরে সব দর ধার্য হলে গরীবরা এই অসমান জীবনসংগ্রামে অনেকটা সুবিধা পাবে। আমি যে একজন

সমাজতন্ত্রী (socialist), তার কারণ এ নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'—এই হিসাবে।

অপর কয়টি প্রথাই জগতে চলেছে, পরিশেষে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হলেও অভিনবত্বের দিক থেকে এটিরও একবার পরীক্ষা করা যাক। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখ-দুঃখটা যাতে পর্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হতে পারে, সেইটাই ভাল। জগতে ভাল-মন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে, তবে নতুন নতুন প্রণালীতে এই জোয়ালটি (yoke) এক কাঁধ থেকে তুলে আর এক কাঁধে স্থাপিত হবে, এই পর্যন্ত।

এই দুঃখময় জগতে সব হতভাগ্যকেই এক-একদিন আরাম করে নিতে দাও—তবেই তারা কালে এই তথাকথিত সুখভোগটুকুর পর এই অসার জগৎ-প্রপঞ্চ, শাসনতন্ত্রাদি ও অন্যান্য বিরক্তিকর বিষয়সকল পরিহার করে ব্রহ্মস্বরূপে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।

সমাজ ও ব্যক্তি

ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কি না এবং কত পরিমাণে হওয়া উচিত, সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির একেবারে সম্পূর্ণ আত্মেচ্ছা, আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত কি না—এই প্রশ্নই সমাজের অনাদি কালের বিচার্য। এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লইয়াই সকল সমাজ ব্যস্ত; আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে ইহাই প্রবল তরঙ্গ-রূপ ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে। যে মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার ইংরেজী নাম সোশ্যালিজম্, ব্যক্তিত্ব-সমর্থক মতের নাম ইণ্ডিভিজুয়ালিজম্।

সমাজের নিকট ব্যক্তির—নিয়মের ও শিক্ষার শাসন দ্বারা চিরদাসত্বের ও বলপূর্বক আত্মবিসর্জনের কি ফল ও পরিণাম, আমাদের মাতৃভূমিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এদেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়; ভোজন-পানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেইপ্রকার; এমনকি, মরিবার সময়ও সেই-সকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ করে। এই কঠোর শিক্ষার একটি মহৎ গুণ আছে, আর সকলই দোষ। গুণটি এই যে, দুটি-একটি কার্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অল্পায়াসে সুন্দর রকমে লোকে করিতে

পারে। তিনখানা মাটির ঢিপি ও খানকতক কাষ্ঠ লইয়া এদেশের রাঁধুনী যে সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা আর কোথাও নাই। একটা মান্ধাতার আমলের এক টাকা দামের তাঁত ও একটা গর্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে ২০ টাকা গজের কিংখাব কেবল এদেশেই হওয়া সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটির প্রদীপ, তায় রেড়ির তেল, এই উপাদান-সহায়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত এদেশেই হয়। খেঁদা-বোঁচা স্ত্রীর উপর সর্বসহিষ্ণু মহত্ত্ব ও নির্গুণ মহাদুষ্ট পতির উপর আজন্ম ভক্তি এদেশেই হয়! এই তো গেল গুণ।

কিন্তু এই সমস্তগুলিই মনুষ্য প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে করে; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী-শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখনও কাটে না, প্রাতঃসূর্যের উজ্জ্বল ছবি কখনও মনকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।

নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভাল হয়, পূর্বপুরুষানুক্রমে সমাগত রীতিনীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম হয়, বল, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্মিক কে? রেলের গাড়ির চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তরখণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গো-মহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে দেখিয়াছে?

অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান রেলের গাড়ীর ইঞ্জিন—তাহারাও জড়; চলে-ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর ঐ যে ক্ষুদ্র কীটাণুটি রেলের গাড়ীর পথ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া গেল, ওটি চৈতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করিতে চায় না; কীটটি নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। ঈশ্বরে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সর্বোচ্চ।

বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? —না। নানাবিধ জ্ঞানার্জন? —তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত

পুরুষানুক্রমে বলপূর্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার শাসনে নূতন ভাবের কথা দূরে থাক, পুরাতনগুলিই একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা? চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা—চৈতন্য-শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর। আর এই মৃৎপিণ্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মতো উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্যসমষ্টির দ্বারা যে সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ? তাহার কল্যাণ কোথায়? কল্যাণ যদি সম্ভব হইত, তবে সহস্র বৎসরের দাস না হইয়া আমরাই পৃথিবীর সর্বোচ্চ জাতি হইতাম, মহামূর্খতার আকর না হইয়া ভারতভূমিই বিদ্যার চিরপ্রস্রবণ হইত।

তবে কি আত্মত্যাগ ধর্ম নহে? বহুর জন্য একের সুখ—একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের ভাষায় বলে, 'ঘষে-মেজে রূপ কি হয়? ধরে-বেঁধে প্রীতি কি হয়?' চিরভিখারীর ত্যাগে কি মাহাত্ম্য? ইন্দ্রিয়হীনের ইন্দ্রিয়সংযমে কি পুণ্য? ভাবহীন, হৃদয়হীন, উচ্চ-আশাহীনের, সমাজের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-জ্ঞানহীনের আবার আত্মোৎসর্গ কি? বলপূর্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? কুসংস্কার শিখাইয়া পুণ্য করানোই বা কেন? আমি বলি, বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পারো বন্ধন খোল। কাদা দিয়ে কাদা ধোয়া যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? কার কেটেছে? সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন তো তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, সে ঢের দূর! আবার তার রাস্তা কি জুলুমের উপর দিয়ে? আহা!! আমাদের বিধবাগুলি কি নিঃস্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত, এমন রীতি কি আর হয়!!! আহা বাল্য-বিবাহ কি মধুর!! সে স্ত্রী-পুরুষে ভালবাসা না হয়ে কি যায়!!! এই বলে নাকে কান্নার এক ধুয়া উঠেছে। আর পুরুষের বেলা অর্থাৎ যাঁদের হাতে চাবুক, তাঁদের বেলা ত্যাগের কিছুই দরকার নাই। সেবাধর্মের চেয়ে কি আর ধর্ম আছে? কিন্তু সেটা বামুন-ঠাকুরের বেলা নহে, তোমরাই কর। আসল কথা, মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি এদেশের—নিজের স্বার্থের জন্য, নিজে সামাজিক অবমাননা হইতে বাঁচিবার জন্য পুত্র-কন্যাদি সব নির্মম হইয়া বলিদান করিতে পারেন, এবং পুরুষানুক্রমে শিক্ষা মানসিক জড়ত্ব বিধান করিয়া উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। যে বীর, সেই ত্যাগ করতে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোখ মুচছে আর এক হাতে দান করছে, তার দানে কি ফল? জগৎপ্রেম অনেক দূর। চারাগাছটিকে ঘিরে রাখতে হয়, যত্ন করতে হয়। একটিকে নিঃস্বার্থভাবে

ভালবাসতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্ট-দেবতাবিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্মে প্রীতি হতে পারে।

অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়। সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাকলে কি কখনও তাহার ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বা কি? অন্ধকার না থাকলে কি কখনও আলোকের মানে হয়?

সকাম সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম, তারপর আপনা-আপনি বড় আসবে।

মা, তুমি চিন্তিত হয়ো না। বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশি জ্বলে, সাপের মাথায় আঘাত লাগলে তবে সে ফণা ধরে ইত্যাদি।[১] যখন হৃদয়ের মধ্যে মহা যাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় ওঠে, বোধ হয় যেন এ-যাত্রা আলো দেখতে পাব না, যখন আশা-ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্তি পায়। ক্ষীর-ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন? কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদো। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন—

'সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥'

—সর্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান ঈশ্বরকে জানিয়া নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না (অর্থাৎ সবই তিনি), তখনই পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

১। তুলনীয় : The wounded Snake its hood unfurls
The flame stirred up doth blaze. etc.
The Song of the Free : Swami Vivekananda

পাশ্চাত্যের কাছে বিজ্ঞান শেখ, আর শেখাও বেদান্ত — আগে মানুষের সেবা

স্থান—বাগবাজার, কলিকাতা
কাল—ফেব্রুআরির শেষ সপ্তাহ, ১৮৯৭

নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে, এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল যে, 'মিরর' সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী বলিলেন, 'তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।' নরেন্দ্রবাবু ছোট ঘরে আসিয়া বসিলেন এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ড সম্বন্ধে স্বামীজীকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। উত্তরে স্বামীজী বলিলেন ঃ

আমেরিকাবাসীর মতো এমন সহৃদয়, উদারচিত্ত, অতিথিসেবাপরায়ণ, নব নব ভাবগ্রহণে একান্ত সমুৎসুক জাতি জগতে আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। আমেরিকায় যা কিছু কাজ হয়েছে, তা আমার শক্তিতে হয়নি; আমেরিকার লোক এত সহৃদয় বলেই তাঁরা বেদান্তভাব গ্রহণ করেছেন।

ইংলণ্ডের কথায় বলিলেন ঃ ইংরেজদের মতো Conservative (প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী) জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নেই। তারা কোন নূতন ভাব সহজে গ্রহণ করতে চায় না, কিন্তু অধ্যবসায়ের সহিত যদি তাদের একবার কোন ভাব বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তবে তারা কিছুতেই তা আর ছাড়ে না। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা অন্য কোন জাতিতে মেলে না। সেইজন্য তারা সভ্যতায় ও শক্তি-সঞ্চয়ে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

উপযুক্ত প্রচারক পাইলে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডেই বেদান্ত-প্রচারকার্য স্থায়ী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা, ইহা জানাইয়া স্বামীজী বলিলেন ঃ

আমি কেবল কাজের পত্তন মাত্র করে এসেছি। পরবর্তী প্রচারকগণ ঐ পন্থা অনুসরণ করলে কালে অনেক কাজ হবে।

নরেন্দ্রবাবু ঃ এইরূপ ধর্মপ্রচার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের কী আশা আছে?

স্বামীজী ঃ আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদান্তধর্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের এখন আর কিছু নেই বললেই হয়। কিন্তু এই সার্বভৌম বেদান্তবাদ—যা সকল মতের, সকল পথের লোককেই

ধর্মলাভের সমান অধিকার প্রদান করে—এর প্রচারের দ্বারা পাশ্চাত্য সভ্য জগৎ জানতে পারবে, ভারতবর্ষে এক সময়ে কি আশ্চর্য ধর্মভাবের স্ফুরণ হয়েছিল এবং এখনও রয়েছে। এই মতের চর্চায় পাশ্চাত্য জাতির আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হবে—অনেকটা এখনই হয়েছে। এইরূপে যথার্থ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করতে পারলে আমরা তাদের নিকট ঐহিক জীবনের বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করে জীবন-সংগ্রামে অধিকতর পটু হব। পক্ষান্তরে তারা আমাদের নিকট এই বেদান্তমত শিক্ষা করে পারমার্থিক কল্যাণ-লাভে সমর্থ হবে।

নরেন্দ্রবাবু ঃ এই আদান-প্রদানে আমাদের রাজনৈতিক কোন উন্নতির আশা আছে কি?

স্বামীজী ঃ ওরা (পাশ্চাত্যেরা) মহাপরাক্রান্ত বিরোচনের[১] সন্তান; ওদের শক্তিতে পঞ্চভূত ক্রীড়াপুত্তলিকার মতো কাজ করছে; আপনারা যদি মনে করেন, আমরা এদের সঙ্গে সংঘর্ষে ঐ স্থূল পাঞ্চভৌতিক শক্তি প্রয়োগ করেই একদিন স্বাধীন হবো, তবে আপনারা নেহাত ভুল বুঝছেন। হিমালয়ের সামনে সামান্য উপলখণ্ড যেমন, ওদের ও আমাদের ঐ শক্তিপ্রয়োগকুশলতায় তেমনি প্রভেদ। আমার মত কি জানেন? আমরা এইরূপে বেদান্তোক্ত ধর্মের গূঢ় রহস্য পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করে, ঐ মহাশক্তিধরগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে ধর্মবিষয়ে চিরদিন ওদের গুরুস্থানীয় থাকব এবং ওরা ইহলৌকিক অন্যান্য বিষয়ে আমাদের গুরু থাকবে। ধর্ম জিনিসটা ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভারতবাসী যেদিন পাশ্চাত্যের পদতলে ধর্ম শিখতে বসবে, সেইদিন এ অধঃপতিত জাতির জাতিত্ব একেবারে ঘুচে যাবে। দিনরাত চিৎকার করে ওদের—'এ দেও, ও দেও' বললে কিছু হবে না। আদান-প্রদানরূপ কাজের দ্বারা যখন উভয়পক্ষের ভিতর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির একটা টান দাঁড়াবে, তখন আর চেঁচামেচি করতে হবে না। ওরা আপনা হতেই সব করবে। আমার বিশ্বাস—এইরূপে, ধর্মের চর্চায় ও বেদান্তধর্মের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্য দেশ—উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনীতিচর্চা এর তুলনায় আমার কাছে গৌণ (secondary) উপায় বলে বোধ হয়।

১। অসুর দেহাত্মবাদী, ভোগবাদী। দ্রষ্টব্য ঃ ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ, ছান্দোগ্য উপ., ৮/৭-৮

আমি এই বিশ্বাস কাজে পরিণত করতে জীবনক্ষয় করব। আপনারা ভারতের কল্যাণ অন্যভাবে সাধিত হবে বুঝে থাকেন তো অন্যভাবে কাজ করে যান।

নরেন্দ্রবাবু স্বামীজীর কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ বাদে উঠিয়া গেলেন। শিষ্য স্বামীজীর পূর্বোক্ত কথাগুলি শুনিয়া অবাক হইয়া তাঁহার দীপ্ত মূর্তির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

নরেন্দ্রবাবু চলিয়া গেলে পর, গোরক্ষিণী সভার জনৈক উদ্যোগী প্রচারক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে উপস্থিত হইলেন। পুরা না হইলেও ইঁহার বেশভূষা অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো—মাথায় গেরুয়া-রঙের পাগড়ি বাঁধা, দেখিলেই বুঝা যায়—ইনি হিন্দুস্থানী। গোরক্ষা-প্রচারকের আগমন-বার্তা পাইয়া স্বামীজী বাহিরের ঘরে আসিলেন। প্রচারক স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া গোমাতার একখানি ছবি তাঁহাকে উপহার দিলেন। স্বামীজী উহা হাতে লইয়া, নিকটবর্তী অপর এক ব্যক্তির হাতে দিয়া তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত আলাপ করিয়াছিলেন ঃ

স্বামীজী ঃ আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি?

প্রচারক ঃ আমরা দেশের গোমাতাগণকে কসাইয়ের হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকি। স্থানে স্থানে পিঁজরাপোল স্থাপন করা হইয়াছে। সেখানে রুগ্ন, অকর্মণ্য এবং কসাইয়ের হাত হইতে ক্রীত গোমাতাগণ প্রতিপালিত হন।

স্বামীজী ঃ এ অতি উত্তম কথা। আপনাদের আয়ের পন্থা কি?

প্রচারক ঃ দয়াপরবশ হইয়া আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ যাহা কিছু দেন, তাহা দ্বারাই সভার ঐ কার্য নির্বাহ হয়।

স্বামীজী ঃ আপনাদের গচ্ছিত কত টাকা আছে?

প্রচারক ঃ মারোয়াড়ী বণিকসম্প্রদায় এ কার্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা এই সৎকার্যে বহু অর্থ দিয়াছেন।

স্বামীজী ঃ মধ্য-ভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ভারত গভর্নমেন্ট নয় লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করেছেন। আপনাদের সভা এই দুর্ভিক্ষকালে কোন সাহায্যদানের আয়োজন করেছে কি?

প্রচারক : আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবলমাত্র গোমাতাগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত।

স্বামীজী : যে দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাতভাই লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হল, সামর্থ্য সত্ত্বেও আপনারা এই ভীষণ দুর্দিনে তাদের অন্ন দিয়ে সাহায্য করা উচিত মনে করেননি?

প্রচারক : না। লোকের কর্মফলে—পাপে এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' হইয়াছে।

প্রচারকের কথা শুনিয়া স্বামীজীর বিশাল নয়নপ্রান্তে যেন অগ্নিকণা স্ফুরিত হইতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইল; কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন :

> যে সভা-সমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনশনে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্য একমুষ্টি অন্ন না দিয়ে পশু-পক্ষী রক্ষার জন্য রাশি রাশি অন্ন বিতরণ করে, তার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই; তার দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উপকার হয় বলে আমার বিশ্বাস নেই। কর্মফলে মানুষ মরছে—এরূপে কর্মের দোহাই দিলে জগতে কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটাই একেবারে বিফল বলে সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষার কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে—গোমাতারা নিজ নিজ কর্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন, আমাদের ওতে কিছু করবার প্রয়োজন নেই।

প্রচারক : (একটু অপ্রতিভ হইয়া) হাঁ, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু শাস্ত্র বলে—গরু আমাদের মাতা।

স্বামীজী : (হাসিতে হাসিতে) হাঁ, গরু আমাদের যে মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি—তা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?

হিন্দুস্থানী প্রচারক ঐ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া (বোধ হয় স্বামীজীর বিষম বিদ্রূপ তিনি বুঝিতেই পারিলেন না।) স্বামীজীকে বলিলেন যে, সেই সমিতির উদ্দেশ্যে তিনি তাহার কাছে কিছু ভিক্ষাপ্রার্থী।

স্বামীজী : আমি তো সন্ন্যাসী ফকির লোক। আমি কোথায় অর্থ পাব, যাতে আপনাদের সাহায্য করব? তবে আমার হাতে যদি কখনও অর্থ হয়,

আগে মানুষের সেবায় ব্যয় করব; মানুষকে আগে বাঁচাতে হবে—অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্মদান করতে হবে। এ-সব করে যদি অর্থ বাকি থাকে, তবে আপনাদের সমিতিতে কিছু দেওয়া যাবে।

কথা শুনিয়া প্রচারক মহাশয় স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন স্বামীজী আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন ঃ

কি কথাই বললে! বলে কিনা—কর্মফলে মানুষ মরছে, তাদের দয়া করে কি হবে? দেশটা যে অধঃপাতে গেছে, এই তার চূড়ান্ত প্রমাণ। তোদের হিন্দুধর্মের কর্মবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখলি? মানুষ হয়ে মানুষের জন্যে যাদের প্রাণ না কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ?

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর সর্বাঙ্গ যেন ক্ষোভে দুঃখে শিহরিয়া উঠিল।

সংগ্রামই জীবনের চিহ্ন

স্থান—কলিকাতা হইতে কাশীপুর যাইবার পথে ও
গোপাললাল শীলের বাগানে।
কাল—ফেব্রুআরি বা মার্চ, ১৮৯৭

স্বামীজী আজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ[১] মহাশয়ের বাটীতে মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতেছিলেন। শিষ্য সেখানে আসিয়া প্রণাম করিয়া দেখিল, স্বামীজী তখন গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে যাইবার জন্য প্রস্তুত। গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। শিষ্যকে বলিলেন, 'চল্, আমার সঙ্গে।' শিষ্য সম্মত হইলে স্বামীজী তাহাকে সঙ্গে লইয়া গাড়িতে উঠিলেন; গাড়ি ছাড়িল। চিৎপুরের রাস্তায় আসিয়া গঙ্গাদর্শন হইবামাত্র স্বামীজী আপন মনে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, 'গঙ্গা-তরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং'[২] ইত্যাদি। শিষ্য মুগ্ধ হইয়া সে অদ্ভুত স্বরলহরী নিঃশব্দে শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইলে একখানা রেলের ইঞ্জিন চিৎপুর 'হাইড্রলিক ব্রিজের' দিকে যাইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'দেখ্, দেখি কেমন সিঙ্গির মতো যাচ্ছে'।

১। বিখ্যাত নট ও নাট্যকার শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ
২। ব্যাসকৃত 'বিশ্বনাথস্তবঃ'

শিষ্য বলিল :

ইহা তো জড়। ইহার পশ্চাতে মানুষের চেতনশক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তবে তো ইহা চলিতেছে। ঐরূপে চলায় ইহার নিজের বাহাদুরি আর কি আছে?

স্বামীজী : বল্ দেখি, চেতনের লক্ষণ কি?

শিষ্য : কেন মহাশয়, যাহাতে বুদ্ধিপূর্বক ক্রিয়া দেখা যায়, তাহাই চেতন।

স্বামীজী : যা nature-এর against-এ rebel (প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ) করে, তাই চেতন; তাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে। দেখ্ না, একটা সামান্য পিঁপড়েকে মারতে যা, সেও জীবন রক্ষার জন্য একবার rebel (লড়াই) করবে। যেখানে struggle (চেষ্টা বা পুরুষকার), যেখানে rebellion (বিদ্রোহ), সেখানেই জীবনের চিহ্ন—সেখানেই চৈতন্যের বিকাশ।

শিষ্য : মানুষের ও মনুষ্যজাতিসমূহের সম্বন্ধেও কি ঐ নিয়ম খাটে?

স্বামীজী : খাটে কি না একবার জগতের ইতিহাসটা পড়ে দেখ্ না। দেখবি, তোরা ছাড়া আর সব জাতি সম্বন্ধেই ঐ কথা খাটে। তোরাই কেবল জগতে আজকাল জড়বৎ পড়ে আছিস। তোদের hypnotise (বিমোহিত) করে ফেলেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে অন্যে বলেছে—তোরা হীন, তোদের কোন শক্তি নেই। তোরাও তাই শুনে আজ হাজার বচ্ছর হতে চলল, ভাবছিস—আমরা হীন, সব বিষয়ে অকর্মণ্য! ভেবে ভেবে তাই হয়ে পড়েছিস। (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ দেহও তো তোদের দেশের মাটি থেকেই জন্মেছে। আমি কিন্তু কখনও ওরূপ ভাবিনি। তাই দেখ্ না তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছায়, যারা আমাদের চিরকাল হীন মনে করে, তারাই আমাকে দেবতার মতো খাতির করেছে ও করছে। তোরাও যদি ঐরূপ ভাবতে পারিস—'আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে' এবং অনন্তের ঐ শক্তি জাগাতে পারিস তো তোরাও আমার মতো হতে পারিস।

শিষ্য : ঐরূপ ভাবিবার শক্তি কোথায়, মহাশয়? বাল্যকাল হইতেই ঐ কথা শোনায় ও বুঝাইয়া দেয়, এমন শিক্ষক বা উপদেষ্টাই বা কোথায়?

লেখাপড়া করা আজকাল কেবল চাকরি-লাভের জন্য—এই কথাই আমরা সকলের নিকট হইতে শুনিয়াছি ও শিখিয়াছি।

স্বামীজী : তাইতো আমরা এসেছি অন্যরূপ শেখাতে ও দেখাতে। তোরা আমাদের কাছ থেকে ঐ তত্ত্ব শেখ্, বোঝ্, অনুভূতি কর্—তারপর নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ঐ ভাব ছড়িয়ে দে। সকলকে গিয়ে বল্—'ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, এ কথা বিশ্বাস কর, তাহলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে।' ঐ কথা সকলকে বল্ এবং সেই সঙ্গে সাদা কথায় বিজ্ঞান দর্শন ভূগোল ও ইতিহাসের মূল কথাগুলি mass-এর (সাধারণের) ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) তৈয়ার করব—প্রথম তাদের শেখাব, তারপর তাদের দিয়ে এই কাজ করাব, মতলব করেছি।

শিষ্য : কিন্তু মহাশয়, ঐরূপ করা তো অনেক অর্থসাপেক্ষ। টাকা কোথায় পাইবেন?

স্বামীজী : তুই কি বলছিস্? মানুষেই তো টাকা করে। টাকায় মানুষ করে, এ-কথা কবে কোথায় শুনেছিস? তুই যদি মন মুখ এক করতে পারিস, কথায় ও কাজে এক হতে পারিস তো জলের মতো টাকা আপনা-আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে।

শিষ্য : আচ্ছা মহাশয়, না হয় স্বীকারই করিলাম যে, টাকা আসিল এবং আপনি ঐরূপে সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিলেন। তাহাতেই বা কি? ইতঃপূর্বেও কত মহাপুরুষ কত ভাল ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন। সে-সকল এখন কোথায়? আপনার প্রতিষ্ঠিত কার্যেরও সময়ে ঐরূপ দশা হইবে নিশ্চয়। তবে ঐরূপ উদ্যমের আবশ্যকতা কি?

স্বামীজী : পরে কি হবে সর্বদা এ কথাই যে ভাবে, তার দ্বারা কোন কাজই হতে পারে না। যা সত্য বলে বুঝেছিস, তা এখনি করে ফেল্; পরে কি হবে না হবে, সে-কথা ভাববার দরকার কি? এতটুকু তো জীবন—তার ভিতর অত ফলাফল খতালে কি কোন কাজ হতে

পারে? ফলাফলদাতা একমাত্র তিনি (ঈশ্বর), যা হয় করবেন। সে কথায় তোর কাজ কি? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ করে যা।

সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী

স্থান—আলমবাজার মঠ, কলিকাতা
কাল—এপ্রিল, ১৮৯৭

রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী কেবল সন্ন্যাসধর্ম-বিষয়েই কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসব্রত-গ্রহণোৎসুক ব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হলে কেউ কখনও ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না—একথা বেদ-বেদান্ত ঘোষণা করছে। যারা বলে—এ সংসারও করব, ব্রহ্মজ্ঞও হব—তাদের কথা আদপেই শুনবিনি। ও-সব প্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোকবাক্য। এতটুকু সংসারের ভোগেচ্ছা যার রয়েছে, এতটুকু কামনা যার রয়েছে, এ কঠিন পন্থা ভেবে তার ভয়; তাই আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্য বলে বেড়ায়, একূল ওকূল—দুকূল রেখে চলতে হবে। ও পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ, অশাস্ত্রীয় অবৈদিক মত। ত্যাগ ছাড়া মুক্তি নেই। ত্যাগ ছাড়া পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ—ত্যাগ। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়'। গীতাতেও আছে—'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ[১]।

সংসারের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে না দিলে কারও মুক্তি হয় না। সংসারাশ্রমে যে রয়েছে, একটা না একটা কামনার দাস হয়েই যে সে ঐরূপে বদ্ধ রয়েছে, ওতেই তা প্রমাণ হচ্ছে। নইলে সংসারে থাকবে কেন? হয় কামিনীর দাস, নয় অর্থের দাস, নয় মান যশ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে বেরিয়ে পড়লে তবে মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হতে পারা যায়। যে যতই বলুক না কেন, আমি বুঝেছি, এ-সব ছেড়ে-ছুড়ে না দিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ না করলে কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নেই, কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা নেই।

শিষ্য ঃ মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি সিদ্ধিলাভ হয়?

১। গীতা, ১৮।২

স্বামীজী : সিদ্ধ হয় কি না হয় পরের কথা। তুই যতক্ষণ না এই ভীষণ সংসারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়তে পারছিস—যতক্ষণ না বাসনার দাসত্ব ছাড়তে পারছিস, ততক্ষণ তোর ভক্তি মুক্তি কিছুই লাভ হবে না। ব্রহ্মজ্ঞের কাছে সিদ্ধি ঋদ্ধি অতি তুচ্ছ কথা।

শিষ্য : মহাশয়, সন্ন্যাসের কোনরূপ কালাকাল বা প্রকার-ভেদ আছে কি?

স্বামীজী : সন্ন্যাসধর্ম-সাধনের কালাকাল নেই। শ্রুতি বলছেন, 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—যখনি বৈরাগ্যের উদয় হবে, তখনি প্রব্রজ্যা করবে।[১] যোগবাশিষ্ঠেও রয়েছে—

যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাদ্ অনিত্যং খলু জীবিতং।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি ॥

—জীবনের অনিত্যতাবশতঃ যুবকালেই ধর্মশীল হবে। কে জানে কার কখন দেহ যাবে? শাস্ত্রে চতুর্বিধ সন্ন্যাসের বিধান দেখতে পাওয়া যায়—বিদ্বৎ সন্ন্যাস, বিবিদিষা সন্ন্যাস, মর্কট সন্ন্যাস এবং আতুর সন্ন্যাস। হঠাৎ ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হল, তখনি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লে—এটি পূর্ব জন্মের সংস্কার না থাকলে হয় না। এরই নাম 'বিদ্বৎ সন্ন্যাস'। আত্মতত্ত্ব জানবার প্রবল বাসনা থেকে শাস্ত্র পাঠ ও সাধনাদি দ্বারা স্ব-স্বরূপ অবগত হবার জন্য কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বাধ্যায় ও সাধন-ভজন করতে লাগল—একে 'বিবিদিষা সন্ন্যাস' বলে। সংসারের তাড়না, স্বজনবিয়োগ বা অন্য কোন কারণে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে সন্ন্যাস নেয়; কিন্তু এ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না, এর নাম 'মর্কট সন্ন্যাস'। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'বৈরাগ্য নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে আবার একটা চাকরি বাগিয়ে নিলে; তারপর চাই কি পরিবার আনলে বা আবার বে করে ফেললে।' আর এক প্রকার সন্ন্যাস আছে, যেমন মুমূর্ষু, রোগশয্যায় শায়িত, বাঁচবার আশা নেই, তখন তাকে সন্ন্যাস দেবার বিধি আছে। সে যদি মরে তো পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে মরে গেল—পরজন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হবে। আর যদি বেঁচে যায় তো আর গৃহে না গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের চেষ্টায় সন্ন্যাসী হয়ে কালযাপন করবে। তোর কাকাকে শিবানন্দ স্বামী 'আতুর সন্ন্যাস' দিয়েছিলেন। সে মরে গেল, কিন্তু ঐরূপে সন্ন্যাস-গ্রহণে তার উচ্চ জন্ম হবে। সন্ন্যাস না নিলে কিন্তু আত্মজ্ঞানলাভের আর উপায়ান্তর নেই।

১। জাবাল উপঃ, ৪

শিষ্য : মহাশয়, গৃহীদের তবে উপায়?

স্বামীজী : সুকৃতিবশতঃ কোন-না-কোন জন্মে তাদের বৈরাগ্য হবে। বৈরাগ্য এলেই হয়ে গেল—জন্ম-মৃত্যু-প্রহেলিকার পারে যাবার আর দেরি হয় না। তবে সকল নিয়মেই দু-একটা exception (ব্যতিক্রম) আছে। ঠিক ঠিক গৃহীর ধর্ম পালন করেও দু-একজন মুক্ত পুরুষ হতে দেখা যায়; যেমন আমাদের মধ্যে 'নাগ মহাশয়'।

শিষ্য : মহাশয়, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-বিষয়ে উপনিষদাদি গ্রন্থেও বিশদ উপদেশ পাওয়া যায় না।

স্বামীজী : পাগলের মতো কি বলছিস? বৈরাগ্যই উপনিষদের প্রাণ। বিচারজনিত প্রজ্ঞাই উপনিষদ্-জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। তবে আমার বিশ্বাস, ভগবান বুদ্ধদেবের পর থেকেই ভারতবর্ষে এই ত্যাগব্রত বিশেষরূপে প্রচারিত হয়েছে এবং বৈরাগ্য ও বিষয়বিতৃষ্ণাই ধর্মের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সেই ত্যাগ-বৈরাগ্য হিন্দুধর্ম absorb (নিজের ভিতর হজম) করে নিয়েছে। ভগবান বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মায়নি।

শিষ্য : তবে কি মহাশয়, বুদ্ধদেব জন্মাইবার পূর্বে দেশে ত্যাগ-বৈরাগ্যের অল্পতা ছিল এবং দেশে সন্ন্যাসী ছিল না?

স্বামীজী : তা কে বললে? সন্ন্যাসাশ্রম ছিল, কিন্তু উহাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে সাধারণের জানা ছিল না, বৈরাগ্যে দৃঢ়তা ছিল না, বিবেক-নিষ্ঠা ছিল না। সেই জন্য বুদ্ধদেব কত যোগী, কত সাধুর কাছে গিয়ে শান্তি পেলেন না। তারপর 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং'[১] বলে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য নিজেই বসে পড়লেন এবং প্রবুদ্ধ হয়ে তবে উঠলেন। ভারতবর্ষের এই যে সব সন্ন্যাসীর মঠ-ফঠ দেখতে পাচ্ছিস—এ-সব বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল, হিন্দুরা সেই-সকলকে

১। ললিতবিস্তর

এখন তাদের রঙে রাঙিয়ে নিজস্ব করে বসেছে। ভগবান বুদ্ধদেব হতেই যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমের সূত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমের মৃতকঙ্কালে প্রাণসঞ্চার করে গেছেন।

স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেও ভারতে আশ্রম-চতুষ্টয় যে ছিল, সংহিতা-পুরাণাদি তার প্রমাণস্থল।

স্বামীজী : মন্বাদি সংহিতা, পুরাণসকলের অধিকাংশ এবং মহাভারতের অনেকটাও সেদিনকার শাস্ত্র। ভগবান বুদ্ধ তার ঢের আগে।

রামকৃষ্ণানন্দ : তাহলে বেদে, উপনিষদে, সংহিতায়, পুরাণে বৌদ্ধধর্মের সমালোচনা নিশ্চয় থাকত; কিন্তু এই-সকল প্রাচীন গ্রন্থে যখন বৌদ্ধধর্মের আলোচনা দেখা যায় না, তখন তুমি কি করে বলবে—বুদ্ধদেব তার আগেকার লোক? দু-চারখানি প্রাচীন পুরাণাদিতে বৌদ্ধমতের আংশিক বর্ণনা রয়েছে, তা দেখে কিন্তু বলা যায় না যে, হিন্দুর সংহিতা পুরাণাদি আধুনিক শাস্ত্র।

স্বামীজী : History (ইতিহাস) পড়ে দেখ্। দেখতে পাবি, হিন্দুধর্ম বুদ্ধদেবের সব ভাবগুলি absorb (হজম) করে এত বড় হয়েছে।

রামকৃষ্ণানন্দ : আমার বোধ হয়, ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি জীবনে ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করে বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের ভাবগুলি সজীব করে গেছেন মাত্র।

স্বামীজী : ঐ কথা কিন্তু প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেকার কোন History (প্রামাণ্য ইতিহাস) পাওয়া যায় না। History-কে (ইতিহাসকে) authority (প্রমাণ) বলে মানলে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, পুরাকালের ঘোর অন্ধকারে ভগবান বুদ্ধদেবই একমাত্র জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।

(পুনরায় সন্ন্যাসধর্মের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল)

সন্ন্যাসের origin (উৎপত্তি) যখনই হোক না কেন, মানব-জন্মের goal (উদ্দেশ্য) হচ্ছে এই ত্যাগব্রত-অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া। সন্ন্যাস-গ্রহণই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। বৈরাগ্য উপস্থিত হবার পর যারা সংসারে বীতরাগ হয়েছে, তারাই ধন্য।

শিষ্য : মহাশয়, আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের ব্যবহারিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতি হইয়াছে। গৃহস্থের মুখাপেক্ষী হইয়া সাধুরা নিষ্কর্মা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান বলিয়া ইঁহারা বলেন, সন্ন্যাসীরা সমাজ ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সহায়ক হন না।

স্বামীজী : লৌকিক বা ব্যবহারিক উন্নতি কথাটার মানে কি, আগে আমায় বুঝিয়ে বল্ দেখি।

শিষ্য : পাশ্চাত্য যেমন বিদ্যাসহায়ে দেশে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে, বিজ্ঞানসহায়ে দেশে বাণিজ্য-শিল্প পোশাক-পরিচ্ছদ রেল-টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানাবিষয়ের উন্নতিসাধন করিতেছে, সেইরূপ করা।

স্বামীজী : মানুষের মধ্যে রাজোগুণের অভ্যুদয় না হলে এসব হয় কি? ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলুম, কোথাও রজোগুণের বিকাশ নেই। কেবল তমো—তমো—ঘোর তমোগুণে ইতর-সাধারণ সকলে পড়ে রয়েছে। কেবল সন্ন্যাসীদের ভেতরেই দেখেছি রজঃ ও সত্ত্বগুণ রয়েছে; এরাই ভারতের মেরুদণ্ড, যথার্থ সন্ন্যাসী— গৃহীদের উপদেষ্টা। তাদের উপদেশ ও জ্ঞানালোক পেয়েই পূর্বে অনেক সময়ে গৃহীরা জীবনসংগ্রামে কৃতকার্য হয়েছিল। সন্ন্যাসীদের বহুমূল্য উপদেশের বিনিময়ে গৃহীরা তাদের অন্নবস্ত্র দেয়। এই আদান-প্রদান না থাকলে ভারতবর্ষের লোক এতদিনে আমেরিকার Red Indian-দের (আদিম অধিবাসীদের) মতো প্রায় extinct (উজাড়) হয়ে যেত। গৃহীরা সন্ন্যাসীদের দুমুঠো খেতে দেয় বলে গৃহীরা এখনও উন্নতির পথে যাচ্ছে। সন্ন্যাসীরা কর্মহীন নয়। তারাই হচ্ছে কার্যের fountain-head (উৎস)। উচ্চ আদর্শসকল তাদের জীবনে বা কাজে পরিণত করতে দেখে এবং তাদের কাছ থেকে ঐসব idea (উচ্চ ভাব) নিয়েই গৃহীরা কর্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে সমর্থ হয়েছে ও হচ্ছে। পবিত্র সন্ন্যাসীদের দেখেই গৃহস্থেরা পবিত্র ভাবগুলি জীবনে পরিণত করছে এবং ঠিক ঠিক কর্মতৎপর হচ্ছে। সন্ন্যাসীরা নিজ জীবনে ঈশ্বরার্থে ও জগতের কল্যাণার্থে সর্বস্বত্যাগ-রূপ তত্ত্ব প্রতিফলিত করে গৃহীদের সব বিষয়ে উৎসাহিত করছে, আর বিনিময়ে তারা তাদের দু-মুঠো অন্ন দিচ্ছে। দেশের লোকের

সেই অন্ন জন্মাবার প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতাও আবার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদেই বর্ধিত হচ্ছে। না বুঝেই লোকে সন্ন্যাস institution (আশ্রম)-এর নিন্দা করে। অন্য দেশে যাই হোক না কেন, এদেশে কিন্তু সন্ন্যাসীরা হাল ধরে আছে বলেই সংসার-সাগরে গৃহস্থদের নৌকা ডুবছে না।

শিষ্য : মহাশয়, লোক-কল্যাণে তৎপর যথার্থ সন্ন্যাসী কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়?

স্বামীজী : হাজার বৎসর অন্তর যদি ঠাকুরের ন্যায় একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ আসেন তো ভরপুর। তিনি যে-সকল উচ্চ আদর্শ ও ভাব দিয়ে যাবেন, তা নিয়ে তাঁর জন্মাবার হাজার বৎসর পর অবধি লোকে চলবে। এই সন্ন্যাস institution (আশ্রম) দেশে ছিল বলেই তো তাঁর ন্যায় মহাপুরুষেরা এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। দোষ সব আশ্রমেই আছে, তবে অল্পাধিক। দোষ সত্ত্বেও এতদিন পর্যন্ত যে এই আশ্রম সকল আশ্রমের শীর্ষস্থান অধিকার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কারণ কি? যথার্থ সন্ন্যাসীরা নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত উপেক্ষা করেন, জগতের ভাল করতেই তাঁদের জন্ম। এমন সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি যদি তোরা কৃতজ্ঞ না হস্ তো তোদের ধিক্—শত ধিক্।

—বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসাশ্রমের গৌরবপ্রসঙ্গে স্বামীজী যেন মূর্তিমান 'সন্ন্যাস'রূপে শিষ্যের চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ-আশ্রমের গৌরব তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে করিতে যেন অন্তর্মুখ হইয়া আপনা-আপনি মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন :

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥[১]

১। কৌপীনপঞ্চকম্—শঙ্করাচার্য

পরে আবার বলিতে লাগিলেন :

'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যে এই ideal (উচ্চ আদর্শ) ভুলে যায়, 'বৃথৈব তস্য জীবনম্'। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্র-বিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।

গুরুভ্রাতাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন :

'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আমাদের জন্ম; কি করছিস সব বসে বসে? ওঠ্—জাগ্ নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্, নরজন্ম সার্থক করে চলে যা। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।

অর্থনৈতিক উন্নতি দরকার—জনসাধারণের ঘুম ভাঙাও

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাড়ি
কাল—১৮৯৮

শিষ্য আজ প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া দাঁড়াইবামাত্র স্বামীজী বলিলেন, কি হবে আর চাকরি করে? না হয় একটা ব্যবসা কর্। শিষ্য তখন এক স্থানে একটি প্রাইভেট মাস্টারি করে মাত্র। সংসারের ভার তখনও তাহার ঘাড়ে পড়ে নাই। আনন্দে দিন কাটায়। শিক্ষকতা-কার্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন :

অনেক দিন মাস্টারি করলে বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায়; জ্ঞানের বিকাশ হয় না। দিনরাত ছেলের দলে থেকে ক্রমে জড়বৎ হয়ে যায়। আর মাস্টারি করিস না।

শিষ্য : তবে কি করিব?

স্বামীজী : কেন? যদি তোর সংসারই করতে হয়, যদি অর্থ-উপায়ের স্পৃহাই থাকে, তবে যা—আমেরিকায় চলে যা। আমি ব্যবসায়ের বুদ্ধি দেব। দেখবি পাঁচ বছরে কত টাকা এনে ফেলতে পারবি।

শিষ্য : কি ব্যবসা করিব? টাকাই বা কোথা হইতে পাইব?

স্বামীজী : পাগলের মতো কি বকছিস? ভেতরে অদম্য শক্তি রয়েছে। শুধু 'আমি কিছু নই' ভেবে ভেবে বীর্যহীন হয়ে পড়েছিস। তুই কেন? —সব জাতটা তাই হয়ে পড়েছে! একবার বেড়িয়ে আয়—দেখবি ভারতেতর দেশে লোকের জীবনপ্রবাহ কেমন তরতর করে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর তোরা কি করছিস? এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মতো 'চাকরি দাও, চাকরি দাও' বলে চেঁচাচ্ছিস। জুতো খেয়ে খেয়ে—দাসত্ব করে করে তোরা কি আর মানুষ আছিস! তোদের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। এমন সজলা সফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে ধন-ধান্য প্রসব করছেন, সেখানে দেহধারণ করে তোদের পেটে অন্ন নেই, পিঠে কাপড় নেই! যে দেশের ধন-ধান্য পৃথিবীর অন্য সব দেশে civilisation (সভ্যতা) বিস্তার করেছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন দুর্দশা? ঘৃণিত কুকুর অপেক্ষাও যে তোদের দুর্দশা হয়েছে! তোরা আবার তোদের বেদ-বেদান্তের বড়াই করিস! যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনধারণ করে, সে জাতের আবার বড়াই! ধর্মকর্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিস জন্মায়। বিদেশী লোক সেই raw material (কাঁচামাল) দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মতো তাদের মাল টেনে মরছিস। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশ-বিদেশের লোক তাই নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিস তয়ের করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে 'হা অন্ন, হা অন্ন' করে বেড়াচ্ছিস!

শিষ্য : কি উপায়ে অন্ন-সংস্থান হইতে পারে, মহাশয়?

স্বামীজী : উপায় তোদেরই হাতে রয়েছে। চোখে কাপড় বেঁধে বলছিস, 'আমি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাই না!' চোখের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল্, দেখবি মধ্যাহ্ন-সূর্যের কিরণে জগৎ আলো হয়ে রয়েছে। টাকা না জোটে তো জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দিশি কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা-ইওরোপে পথে পথে ফেরি

করগে। দেখবি—ভারত-জাত জিনিসের এখনও কত কদর! আমেরিকায় দেখলুম, হুগলি জেলার কতকগুলি মুসলমান ঐরূপে ফেরি করে করে ধনবান হয়ে পড়েছে। তাদের চেয়েও কি তোদের বিদ্যাবুদ্ধি কম? এই দেখ্-না—এদেশে যে বেনারসী শাড়ি হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে আমেরিকায় চলে যা। সে দেশে ঐ কাপড়ে গাউন তৈরি করে বিক্রি করতে লেগে যা, দেখবি কত টাকা আসে।

শিষ্য : মহাশয়, তারা বেনারসী শাড়ির গাউন পরিবে কেন? শুনেছি, চিত্র-বিচিত্র কাপড় ওদেশের মেয়েরা পছন্দ করে না।

স্বামীজী : নেবে কি না, তা আমি বুঝব এখন। তুই উদ্যম করে চলে যা দেখি! আমার বহু বন্ধু-বান্ধব সে দেশে আছে। আমি তোকে তাদের কাছে introduce (পরিচিত) করে দিচ্ছি। তাদের ভেতর ঐগুলি অনুরোধ করে প্রথমটা চালিয়ে দেবো। তারপর দেখবি—কত লোক তাঁদের follow (অনুসরণ) করবে। তুই তখন মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবিনি।

শিষ্য : ব্যবসা করিবার মূলধন কোথায় পাইব?

স্বামীজী : আমি যে করে হোক তোকে start (আরম্ভ) করিয়ে দেবো। তারপর কিন্তু তোর নিজের উদ্যমের উপর সব নির্ভর করবে। 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্'—এই চেষ্টায় যদি মরে যাস তা-ও ভাল, তোকে দেখে আরও দশ জন অগ্রসর হবে। আর যদি success (সফলতা) হয়, তো মহাভোগে জীবন কাটবে।

শিষ্য : আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু সাহসে কুলায় না।

স্বামীজী : তাইতো বলছি বাবা, তোদের শ্রদ্ধা নেই—আত্মপ্রত্যয়ও নেই। কি হবে তোদের? না হবে সংসার, না হবে ধর্ম। হয় ঐ-প্রকার উদ্যোগ উদ্যম করে সংসারে successful (গণ্যমান্য সফল) হ—নয় তো সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আমাদের পথে আয়। দেশ-বিদেশের লোককে ধর্ম উপদেশ দিয়ে তাদের উপকার কর। তবে তো আমাদের মতো ভিক্ষা মিলবে। আদান-প্রদান না থাকলে কেউ কারুর দিকে চায়

না। দেখছিস তো আমরা দুটো ধর্মকথা শোনাই, তাই গেরস্তেরা আমাদের দুমুঠো অন্ন দিচ্ছে। তোরা কিছুই করবিনি, তোদের লোকে অন্ন দেবে কেন? চাকরিতে গোলামিতে এত দুঃখ দেখেও তোদের চেতনা হচ্ছে না, কাজেই দুঃখও দূর হচ্ছে না! এ নিশ্চয়ই দৈবী মায়ার খেলা! ওদেশে দেখলুম, যারা চাকরি করে, Parliament-এ (জাতীয় সমিতিতে) তাদের স্থান পেছনে নির্দিষ্ট। যারা নিজের উদ্যমে বিদ্যায় বুদ্ধিতে স্বনামধন্য হয়েছে, তাদের বসবার জন্যই front seat (সামনের আসনগুলি)। ও-সব দেশে জাত-ফাতের উৎপাত নেই। উদ্যম ও পরিশ্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁদের প্রতি প্রসন্না, তাঁরাই দেশের নেতা ও নিয়ন্তা বলে গণ্য হন। আর তোদের দেশে জাতের বড়াই করে করে তোদের অন্ন পর্যন্ত জুটছে না। একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই, তোরা আবার ইংরেজদের criticise (দোষগুণ-বিচার) করতে যাস—আহাম্মক! ওদের পায়ে ধরে জীবন-সংগ্রামোপযোগী বিদ্যা, শিল্পবিজ্ঞান, কর্মতৎপরতা শিখগে। যখন উপযুক্ত হবি, তখন তোদের আবার আদর হবে। ওরাও তখন তোদের কথা রাখবে। কোথাও কিছুই নেই, কেবল Congress (কংগ্রেস—জাতীয় মহাসমিতি) করে চেঁচামিচি করলে কি হবে?

শিষ্য : মহাশয়, দেশের সমস্ত শিক্ষিত লোকই কিন্তু উহাতে যোগদান করিতেছে।

স্বামীজী : কয়েকটা পাস দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত হলো! যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। আজকালকার এই-সব স্কুল-কলেজে পড়ে তোরা কেমন এক প্রকারের একটা dyspeptic (অজীর্ণরোগাক্রান্ত) জাত তৈরি হচ্ছিস! কেবল machine (কল)-এর মতো খাটছিস, আর 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' এই বাক্যের সাক্ষিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিস। এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্দাফরাস—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশি। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে

যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে। Capital (মূলধন) তাদের হাতে গিয়ে পড়ছে—তোদের মতো তাদের অভাবের জন্য তাড়না নেই। বর্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হাল-চাল বদলে দিচ্ছে, অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোরা এই-সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস, এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে। আর তোরা 'হা চাকরি, জো চাকরি' করে করে লোপ পেয়ে যাবি।

শিষ্য : মহাশয়, অপর দেশের তুলনায় আমাদিগের উদ্ভাবনী শক্তি অল্প হইলেও ভারতের ইতরজাতিসকল তো আমাদের বুদ্ধিতেই চালিত হইতেছে। অতএব ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি ভদ্র জাতিদিগকে জীবনসংগ্রামে পরাজিত করিবার শক্তি ও শিক্ষা ইতরজাতিরা কোথায় পাইবে?

স্বামীজী : তোদের মতো তারা কতকগুলো বই-ই না-হয় না পড়েছে, তোদের মতো শার্ট-কোর্ট পরে সভ্য না-হয় না-ই হতে শিখেছে; তাতে আর কি এল গেল! কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড—সব দেশে। এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্ন-বস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা-হুতাশ লেগে যায়! তিনদিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর উজাড় হয়ে যায়! শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্ন-বস্ত্র জোটে না। এদের তোরা ছোটলোক ভাবছিস, আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই করছিস?

জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একই ভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐরকম হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐ-কথা বুঝতে পারছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই

আগে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই ঐ-কথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা ছোটজাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতরজাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতদের কল্যাণ।

তাই তো বলি, তোরা এই mass (জনসাধারণ) -এর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলগে, 'তোমরা আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ; আমরা তোমাদের ভালবাসি, ঘৃণা করি না'। তোদের এই sympathy (সহানুভূতি) পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞানসহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদান-প্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য : কিন্তু মহাশয়, ইহাদের ভিতর শিক্ষার বিস্তার হইলে ইহারাও তো আবার কালে আমাদের মতো উর্বরমস্তিষ্ক অথচ উদ্যমহীন ও অলস হইয়া উহাদিগের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণী লোকদিগের পরিশ্রমের সারাংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে?

স্বামীজী : তা কেন হবে? জ্ঞানোন্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে, জেলে জেলেই থাকবে, চাষা চাষই করবে। জাত-ব্যবসা ছাড়বে কেন? 'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ'—এই ভাবে শিক্ষা পেলে এরা নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়বে কেন? জ্ঞানবলে নিজেদের সহজাত কর্ম যাতে আরও ভাল করে করতে পারে, সেই চেষ্টা করবে। দু-দশ জন প্রতিভাশালী লোক কালে তাদের ভেতর থেকে উঠবেই উঠবে। তাদের তোরা (ভদ্রজাতিরা) তোদের শ্রেণীর ভেতর করে নিবি। তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, তাতে ক্ষত্রিয়জাতটা ব্রাহ্মণদের কাছে তখন কতদূর কৃতজ্ঞ হয়েছিল—বল দেখি? ঐরূপ sympathy (সহানুভূতি) ও সাহায্য পেলে মানুষ তো দূরের কথা, পশুপক্ষীও আপনার হয়ে যায়।

শিষ্য : মহাশয়, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলেও ভদ্রেতর শ্রেণীর ভিতর এখনও যেন বহু ব্যবধান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের ইতরজাতিদিগের প্রতি ভদ্রলোকদিগের সহানুভূতি আনয়ন করা বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী : তা না হলে কিন্তু তোদের (ভদ্রজাতিদের) কল্যাণ নেই। তোরা চিরকাল যা করে আসছিস—ঘরাঘরি লাঠালাঠি করে সব ধ্বংস হয়ে যাবি; এই mass (জনসাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তোদের ওপর তোদের (ভদ্রলোকদের) অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর civilisation (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙ্গে দেবে। ভেবে দেখ—গল-জাতের হাতে এমন যে প্রাচীন রোমক সভ্যতা কোথায় ধ্বংস হয়ে গেল! এইজন্য বলি, এই-সব নীচজাতদের ভেতর বিদ্যাদান জ্ঞানদান করে এদের ঘুম ভাঙাতে যত্নশীল হ। এরা যখন জাগবে—আর একদিন জাগবে নিশ্চয়ই—তখন তারাও তোদের কৃত উপকার বিস্মৃত হবে না, তোদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

এইরূপ কথোপকথনের পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন : ও-সব কথা এখন থাক; তুই এখন কি স্থির করলি, তা বল। যা হয় একটা কর। হয় কোন ব্যবসায়ের চেষ্টা দেখ, নয় তো আমাদের মতো 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' যথার্থ সন্ন্যাসের পথে চলে আয়। এই শেষ পন্থাই অবশ্য শ্রেষ্ঠ পন্থা; কি হবে ছাই সংসারী হয়ে? বুঝে তো দেখছিস সবই ক্ষণিক—'নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্'।[১] অতএব যদি এই আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে উৎসাহ হয়ে থাকে তো আর কালবিলম্ব করিসনে। এখুনি অগ্রসর হ। 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'। পরার্থে নিজ জীবন বলি দিয়ে লোকের দোরে দোরে গিয়ে অভয়বাণী শোনা—'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।

১। মোহমুদ্গর, শঙ্করাচার্য

পশু ও মানুষের পার্থক্য কি?

স্থান—কলিকাতা

কাল—১৮৯৮

প্রায় সাড়ে চারিটার সময় স্বামীজী নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া পশুশালায় উপস্থিত হইলেন। বাগানের তদানীন্তন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রায় বাহাদুর রামব্রহ্ম সান্যাল পরম সাদরে স্বামীজী ও নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং প্রায় দেড় ঘন্টাকাল তাঁহাদের অনুগমন করিয়া বাগানের নানা স্থান দেখাইতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দও শিষ্যের সঙ্গে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রামব্রহ্মবাবু উদ্যানস্থ নানা বৃক্ষ দেখাইতে দেখাইতে বৃক্ষাদির কালে কিরূপ ক্রমপরিণতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নানা জীবজন্তু দেখিতে দেখিতে স্বামীজীও মধ্যে মধ্যে জীবের উত্তরোত্তর পরিণতি-সম্বন্ধে ডারুইনের (Darwin) মতের আলোচনা করিতে লাগিলেন। শিষ্যের মনে আছে, সর্প-গৃহে যাইয়া তিনি চক্রাঙ্কিতগাত্র একটা প্রকাণ্ড সাপ দেখাইয়া বলিলেন, ইহা হইতেই কালে tortoise (কচ্ছপ) উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সাপই বহুকাল ধরিয়া একস্থানে বসিয়া থাকিয়া ক্রমে কঠোরপৃষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী শিষ্যকে তামাসা করিয়া বলিলেন, তোরা না কচ্ছপ খাস? ডারুইনের মতে এই সাপই কাল-পরিণামে কচ্ছপ হয়েছে; তা হলে তোরা সাপও খাস! ইহা শুনিয়া শিষ্য ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া বলিল, মহাশয়, একটা পদার্থ ক্রমপরিণতির দ্বারা পদার্থান্তর হইয়া গেলে যখন তাহার পূর্বের আকৃতি ও স্বভাব থাকে না, তখন কচ্ছপ খাইলেই যে সাপ খাওয়া হইল—এ কথা কেমন করিয়া বলিতেছেন?

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী ও রামব্রহ্মবাবু হাসিয়া উঠিলেন এবং সিস্টার নিবেদিতাকে ঐ কথা বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনিও হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই যেখানে সিংহব্যাঘ্রাদি ছিল, সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রামব্রহ্মবাবুর আদেশে রক্ষকেরা সিংহব্যাঘ্রের জন্য প্রচুর মাংস আনিয়া আমাদের সম্মুখেই উহাদিগকে আহার করাইতে লাগিল। উহাদের সাহ্লাদ গর্জন শুনিবার এবং সাগ্রহ ভোজন দেখিবার অল্পক্ষণ পরেই উদ্যানমধ্যস্থ রামব্রহ্মবাবুর বাসাবাড়িতে আমরা সকলে উপস্থিত হইলাম। তথায় চা ও জলপানের উদ্যোগ

হইয়াছিল। স্বামীজী অল্পমাত্র চা পান করিলেন। অতঃপর ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ লইয়া কিছুক্ষণ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

রামব্রহ্মবাবু : ডারুইন ক্রমবিকাশবাদ ও তাহার কারণ যেভাবে বুঝাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

স্বামীজী : ডারুইনের কথা সঙ্গত হলেও evolution (ক্রমবিকাশবাদ)-এর কারণ সম্বন্ধে উহা যে চূড়ান্ত মীমাংসা, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারি না।

রামব্রহ্মবাবু : এ বিষয়ে আমাদের দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোনরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন কি?

স্বামীজী : সাংখ্যদর্শনে ঐ বিষয় সুন্দর আলোচিত হয়েছে। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্তই ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা বলে আমার ধারণা।

রামব্রহ্মবাবু : সংক্ষেপে ঐ সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া বলা চলিলে শুনিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী : নিম্ন জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করতে পাশ্চাত্য মতে struggle for existence (জীবন-সংগ্রাম), survival of the fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্তন), natural selection (প্রাকৃতিক নির্বাচন) প্রভৃতি যে-সকল নিয়ম কারণ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে, সে-সকল আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। পাতঞ্জল-দর্শনে কিন্তু এ-সকলের একটিও তার কারণ বলে সমর্থিত হয়নি। পতঞ্জলির মত হচ্ছে, এক species (জাতি) থেকে আর এক species-এ (জাতিতে) পরিণতি 'প্রকৃতির আপূরণের' দ্বারা (প্রকৃত্যাপূরাৎ[১]) সংসাধিত হয়। আবরণ বা obstacles-এর (প্রতিবন্ধক বা বাধার) সঙ্গে দিনরাত struggle (লড়াই) করে যে ওটা সাধিত হয়, তা নয়। আমার বিবেচনায় struggle (লড়াই) এবং competition (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীবনকে ধ্বংস করে

১। পাতঞ্জলযোগসূত্রম্, ৪/২

যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয়—যা পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে, তাহলে বলতে হয়, এই evolution (ক্রমবিকাশ) দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার করে নিলেও আধ্যাত্মিক বিকাশকল্পে ওটা যে বিষম প্রতিবন্ধক, একথা স্বীকার করতেই হয়। আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায়—জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও বিকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির ও বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি সর্বতোভাবে সরে দাঁড়ালে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিম্নস্তরে যাই হোক, উচ্চস্তরে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করেই যে ওদের অতিক্রম করা যায়, তা নয়; দেখা যায় সেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা ও প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় বা অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং obstacle (প্রতিবন্ধক)-গুলিকে আত্মপ্রকাশের কার্য না বলে কারণরূপে নির্দেশ করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা যুক্তিযুক্ত নয়। হাজার পাপীর প্রাণসংহার করে এই জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দ্বারা জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়। কিন্তু উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলে জগতে আর পাপ থাকে না। এখন দেখুন, পাশ্চাত্য Struggle Theory (প্রাণীদের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা উন্নতিলাভরূপ মত)-টা কতদূর horrible (ভীষণ) হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

রামব্রহ্মবাবু স্বামীজীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; অবশেষে বলিলেন, ভারতবর্ষে এখন আপনার ন্যায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞ লোকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ঐরূপ লোকেই একদেশদর্শী শিক্ষিত জনগণের ভ্রমপ্রমাদ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ। আপনার Evolution Theory-র (ক্রমবিকাশবাদের) নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম।

শিষ্য স্বামী যোগানন্দের সহিত ট্রামে করিয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বাগবাজারে ফিরিয়া আসিল। স্বামীজী ঐ সময়ের প্রায় পনর মিনিট পূর্বে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রায় অর্ধঘন্টা বিশ্রামান্তে তিনি বৈঠকখানায় আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী অদ্য পশুশালা দেখিতে গিয়া রামব্রহ্মবাবুর

নিকট ক্রমবিকাশবাদের অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন শুনিয়া উপস্থিত সকলে ঐ প্রসঙ্গ বিশেষরূপে শুনিবার জন্য ইতঃপূর্বেই সমুৎসুক ছিলেন। অতএব স্বামীজী আসিবামাত্র সকলের অভিপ্রায় বুঝিয়া শিষ্য ঐ কথাই পাড়িল।

শিষ্য : মহাশয়, পশুশালায় ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া সহজ কথায় তাহা পুনরায় বলিবেন কি?

স্বামীজী : কেন, কি বুঝিসনি?

শিষ্য : এই আপনি অন্য অনেক সময় আমাদের বলিয়াছেন যে, বাহিরের শক্তিসমূহের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতাই জীবনের চিহ্ন এবং উহাই উন্নতির সোপান। আজ আবার যেন উলটা কথা বলিলেন।

স্বামীজী : উলটো বলব কেন? তুই-ই বুঝতে পারিসনি। Animal kingdom-এ (নিম্ন প্রাণিজগতে) আমরা সত্য-সত্যই struggle for existence, survival of the fittest (জীবনসংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন) প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই ডারুইনের theory (তত্ত্ব) কতকটা সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু human kingdom (মনুষ্যজগৎ)-এ যেখানে rationality (জ্ঞানবুদ্ধি)-র বিকাশ, সেখানে এ নিয়মের উলটোই দেখা যায়। মনে কর, যাঁদের আমরা really great men (বাস্তবিক মহাপুরুষ) বা ideal (আদর্শ) বলে জানি, তাঁদের বাহ্য struggle (সংগ্রাম) একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। Animal kingdom (মনুষ্যেতর প্রাণিজগৎ)-এ instinct (স্বাভাবিক জ্ঞান)-এর প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয়, ততই তাতে rationality (বিচারবুদ্ধি)-র বিকাশ। এজন্য animal kingdom (প্রাণিজগৎ)-এর মতো rational human kingdom (বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্যজগৎ)-এ পরের ধ্বংস সাধন করে progress (উন্নতি) হতে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ evolution (পূর্ণবিকাশ) একমাত্র sacrifice (ত্যাগ) দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে যে যত

ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান জানোয়ার হয়। সুতরাং Struggle Theory (জীবনসংগ্রাম-তত্ত্ব) এ উভয় রাজ্যে equally applicable (সমানভাবে উপযোগী) হতে পারে না। মানুষের struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdom (মানবেতর প্রাণিজগৎ)-এ স্থূল দেহের সংরক্ষণে যে struggle (সংগ্রাম) পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence (মানবজীবন)-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের জন্য বা সত্ত্ব (গুণ) বৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle (সংগ্রাম) চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার মতো মনুষ্যেতর প্রাণীতে ও মনুষ্যজগতে struggle (সংগ্রাম) বিপরীত দেখা যায়।

শিষ্য : তাহা হইলে আপনি আমাদের শারীরিক উন্নতিসাধনের জন্য এত করিয়া বলেন কেন?

স্বামীজী : তোরা কি আবার মানুষ? তবে একটু rationality (বিচারবুদ্ধি) আছে, এই মাত্র। Physique (দেহটা) ভাল না হলে মনের সঙ্গে struggle (সংগ্রাম) করবি কি করে? তোরা কি আর জগতের highest evolution (পূর্ণবিকাশস্থল) 'মানুষ' পদবাচ্য আছিস? আহার নিদ্রা মৈথুন ভিন্ন তোদের আর আছে কি? এখনও যে চতুষ্পদ হয়ে যাসনি, এই ঢের। ঠাকুর বলতেন, 'মান হুঁশ আছে যার, সেই মানুষ'। তোরা তো 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব'- বাক্যের সাক্ষী হয়ে স্বদেশবাসীর হিংসার স্থল ও বিদেশিগণের ঘৃণার আস্পদ হয়ে রয়েছিস। তোরা animal (মনুষ্যেতর প্রাণী), তাই struggle (সংগ্রাম) করতে বলি। থিওরি-ফিওরি রেখে দে। নিজেদের দৈনন্দিন কার্য ও ব্যবহার স্থিরভাবে আলোচনা করে দেখ দেখি, তোরা animal and human planes-এর (মানব ও মানবেতর স্তরের) মধ্যবর্তী জীববিশেষ কি না! Physique (দেহ)-টাকে আগে গড়ে তোল। তবে তো মনের ওপর ক্রমে আধিপত্য লাভ হবে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। বুঝলি?

শিষ্য : মহাশয়, 'বলহীনেন' অর্থে ভাষ্যকার কিন্তু 'ব্রহ্মচর্যহীনেন' বলেছেন।

স্বামীজী : তা বলুনগে। আমি বলছি, the physically weak are unfit for the realisation of the Self (দুর্বল শরীরে আত্মসাক্ষাৎকার হয় না)।

শিষ্য : কিন্তু সবল শরীরে অনেক জড়বুদ্ধিও তো দেখা যায়।

স্বামীজী : তাদের যদি তুই যত্ন করে ভাল idea (ভাব) একবার দিতে পারিস, তা হলে তারা যত শিগগির তা work out (কার্যে পরিণত) করতে পারবে, হীনবীর্য লোক তত শিগগির পারবে না। দেখছিস না, ক্ষীণ শরীরে কাম-ক্রোধের বেগধারণ হয় না। শুঁটকো লোকগুলো শিগগির রেগে যায়—শিগগির কামমোহিত হয়।

শিষ্য : কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামীজী : তা নেই কে বলছে? মনের ওপর একবার control (সংযম) হয়ে গেলে, দেহ সবল থাক বা শুকিয়েই যাক, তাতে আর কিছু এসে যায় না। মোট কথা হচ্ছে physique (শরীর) ভাল না হলে যে আত্মজ্ঞানের অধিকারীই হতে পারে না; ঠাকুর বলতেন, 'শরীরে এতটুকু খুঁত থাকলে জীব সিদ্ধ হতে পারে না।'

মরে তো যাবিই; একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মর

স্থান—বেলুড় মঠ

কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য : স্বামীজী, আপনি এদেশে বক্তৃতা দেন না কেন? বক্তৃতাপ্রভাবে ইওরোপ-আমেরিকা মাতাইয়া আসিলেন, কিন্তু ভারতে ফিরিয়া আপনার ঐ বিষয়ে উদ্যম ও অনুরাগ যে কেন কমিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্যদেশগুলি অপেক্ষা—আমাদের বিবেচনায় এখানেই ঐরূপ উদ্যমের অধিক প্রয়োজন।

স্বামীজী : এদেশে আগে ground (জমি) তৈরি করতে হবে তবে বীজ ফেললে গাছ হবে। পাশ্চাত্যের মাটিই এখন বীজ ফেলবার উপযুক্ত,

খুব উর্বর। ওদেশের লোকেরা এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। ভোগে তৃপ্ত হয়ে এখন তাদের মন তাতে আর শান্তি পাচ্ছে না; একটা দারুণ অভাব বোধ করছে। তোদের দেশে না আছে ভোগ, না আছে যোগ। ভোগের ইচ্ছা কতকটা তৃপ্ত হলে তবে লোকে যোগের কথা শোনে ও বোঝে; অন্নাভাবে ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন; রোগশোক-পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেকচার-ফেকচার দিয়ে কি হবে?

শিষ্য : কেন, আপনিই তো কখনো কখনো বলিয়াছেন, এদেশ ধর্মভূমি। এদেশে লোকে যেমন ধর্মকথা বুঝে ও কার্যতঃ ধর্মানুষ্ঠান করে, অন্যদেশে তেমন নহে। তবে আপনার জ্বলন্ত বাগ্মিতায় দেশ কেন না মাতিয়া উঠিবে—কেন না ফল হইবে?

স্বামীজী : ওরে, ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না করলে তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না, পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির। বিদেশীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাণিজ্যে অবাধ রপ্তানি, সবচেয়ে তোদের পরস্পরের ভেতর ঘৃণিত দাসসুলভ ঈর্ষাই তোদের দেশের অস্থিমজ্জা খেয়ে ফেলেছে। ধর্মকথা শোনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেকচার-ফেকচারে বিশেষ কোন ফল হবে না।

শিষ্য : তবে আমাদের এখন কি করা প্রয়োজন?

স্বামীজী : প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপে তৈরি করছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিভাবে হতে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মতো পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে। তোদের দেশের mass of people (জনসাধারণ) যেন একটা sleeping leviathan (ঘুমন্ত বিরাট জলজন্তু)! এদেশের এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এতে শতকরা

বড়জোর একজন কি দুজন দেশের লোক শিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে—তারাও দেশের হিতের জন্য কিছু করে উঠতে পারছে না। কি করেই বা বেচারি করবে বল? কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে সে সাত ছেলের বাপ! তখন যা তা করে একটা কেরানীগিরি, বড়জোর একটা ডেপুটিগিরি জুটিয়ে নেয়। এই হলো শিক্ষার পরিণাম! তারপর সংসারের ভারে উচ্চকর্ম উচ্চ চিন্তা করবার তাদের আর সময় কোথায়? তার নিজের স্বার্থই সিদ্ধ হয় না; পরার্থে সে আবার কি করবে?

শিষ্য : তবে কি আমাদের উপায় নাই?

স্বামীজী : অবশ্য আছে। এ সনাতন ধর্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু নিশ্চয় আবার উঠবে। এমন উঠবে যে, জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে। দেখিসনি নদী বা সমুদ্রে তরঙ্গ যত নামে, তারপর সেটা তত জোরে ওঠে? এখানেও সেইরূপ হবে। দেখছিসনি—পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য ওঠার আর বিলম্ব নেই? তোরা এই সময়ে কোমর বেঁধে লেগে যা— সংসার-ফংসার করে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে-দেশে গাঁয়ে-গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি করে বসে থাকলে চলবে না। শিক্ষাহীন ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে, ভাই সব, ওঠ, জাগো। কতদিন আর ঘুমুবে? আর শাস্ত্রের মহান সত্যগুলি সরল করে তাদের বুঝিয়ে দিগে। এতদিন এদেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্মটা একচেটে করে বসে ছিল। কালের স্রোতে তা যখন আর টিকলো না, তখন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোকে যাতে পায়, তার ব্যবস্থা করগে। সকলকে বোঝাগে ব্রাহ্মণদের মতো তোমাদেরও ধর্মে সমান অধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর। আর সোজা কথায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থজীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখাপড়াকেও ধিক্, আর তোদের বেদবেদান্ত পড়াকেও ধিক।

শিষ্য : মহাশয়, আমাদের সে শক্তি কোথায়? আপনার শতাংশের একাংশ শক্তি থাকিলে নিজেও ধন্য হইতাম, অপরকেও ধন্য করিতে পারিতাম।

স্বামীজী : দূর মূর্খ! শক্তিফক্তি কেউ কি দেয়? ও তোর ভেতরেই রয়েছে, সময় হলেই আপনা-আপনি বেরিয়ে পড়বে। তুই কাজে লেগে যা না; দেখবি এত শক্তি আসবে যে, সামলাতে পারবিনি। পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভেতরের শক্তি জেড়ে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি, কিন্তু ইচ্ছা হয়, তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা—আমি দেখে খুশি হই।

শিষ্য : কিন্তু মহাশয়, যাহারা আমার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের কি হইবে?

স্বামীজী : তুই যদি পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হস তো ভগবান তাদের একটা উপায় করবেনই করবেন। 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—গীতায় পড়েছিস তো?

শিষ্য : আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী : ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা—ত্যাগী না হলে কেউ পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে দেখে, সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়। বেদান্তেও পড়েছিস, সকলকে সমানভাবে দেখতে হবে। তবে একটি স্ত্রী ও কয়েকটি ছেলেকে বেশি আপনার বলে ভাববি কেন? তোর দোরে স্বয়ং নারায়ণ কাঙালবেশে এসে অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছেন, তাঁকে কিছু না দিয়ে খালি নিজের ও নিজের স্ত্রী-পুত্রদেরই উদর নানাপ্রকার চর্ব্য-চূষ্য দিয়ে পূর্তি করা—সে তো পশুর কাজ।

শিষ্য : মহাশয়, পরার্থে কার্য করিতে সময়ে সময়ে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়; তাহা কোথায় পাইব?

স্বামীজী : বলি, যতটুকু ক্ষমতা আছে ততটুকুই আগে কর না। পয়সার অভাবে যদি কিছু না-ই দিতে পারিস—একটা মিষ্টি কথা বা দুটো সৎ উপদেশও তো তাদের শোনাতে পারিস। না—তাতেও তোর টাকার দরকার?

শিষ্য : আজ্ঞে হাঁ, তা পারি।

স্বামীজী : 'হাঁ পারি' কেবল মুখে বললে হচ্ছে না। কি পারিস—তা কাজে আমায় দেখা, তবে তো জানব আমার কাছে আসা সার্থক। লেগে যা। কদিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা। নতুবা গাছ-পাথরও তো হচ্ছে মরছে—ঐরূপ জন্মাতে মরতে মানুষের কখনো ইচ্ছা হয় কি? আমায় কাজে দেখা যে, তোর বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে এই কথা শোনাগে—'তোমাদের ভেতরে অনন্ত শক্তি রয়েছে, সে শক্তিকে জাগিয়ে তোল।' নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তিকামনাও তো মহা স্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান, ফেলে দে মুক্তি-ফুক্তি। আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :

তোরা ঐরূপে আগে জমি তৈরি করগে। আমার মতো হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা করতে নরলোকে শরীর ধারণ করবে; তার জন্য ভাবনা নেই। এই দেখ না, আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের) ভেতর যারা আগে ভাবত তাদের কোন শক্তি নেই, তারাই এখন অনাথ-আশ্রম, দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড কত কি খুলছে! দেখছিস না—নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও তোদের সেবা করতে শিখেছে। আর তোরা তোদের নিজের দেশের লোকের জন্য তা করতে পারবিনি? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেদিকে; নয়—মরেই যাবি। তোর আমার মতো কত কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের কি আসছে যাচ্ছে? একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই; তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা-ভরসা। তোদের কর্মহীন দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা—লেগে যা। দেরি করিসনি—মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে। পরে করবি বলে বসে থাকিসনি—তা হলে কিছুই হবে না।

দেশের দুর্দশার জন্য দেশবাসীই দায়ী, উন্নতিও তাদেরই হাতে

স্থান—বেলুড় মঠ
কাল—(ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য : স্বামীজী, বর্তমান কালে আমাদের সমাজ ও দেশের এত দুর্দশা হইয়াছে কেন?

স্বামীজী : তোরাই সেজন্য দায়ী।

শিষ্য : বলেন কি? কেমন করিয়া?

স্বামীজী : বহুকাল থেকে দেশের নীচ জাতদের ঘেন্না করে করে তোরা এখন জগতে ঘৃণাভাজন হয়ে পড়েছিস!

শিষ্য : কবে আবার আমরা উহাদের ঘৃণা করিলাম?

স্বামীজী : কেন? ভট্‌চাযের দল তোরাই তো বেদবেদান্তাদি যত সারবান শাস্ত্রগুলি ব্রাহ্মণেতর জাতদের কখনও পড়তে দিসনি, তাদের ছুঁসনি, তাদের কেবল নিচে দাবিয়ে রেখেছিস, স্বার্থপরতা থেকে তোরাই তো চিরকাল ঐরূপ করে আসছিস। ব্রাহ্মণেরাই তো ধর্মশাস্ত্রগুলিকে একচেটে করে বিধি-নিষেধ তাদেরই হাতে রেখেছিল; আর ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতগুলিকে নীচ বলে বলে তাদের মনে ধারণা করিয়ে দিয়েছিল যে, তারা সত্যসত্যই হীন। তুই যদি একটা লোককে খেতে শুতে বসতে সর্বক্ষণ বলিস, 'তুই নীচ, তুই নীচ'—তবে সময়ে তার ধারণা হবেই হবে, 'আমি সত্য-সত্যই নীচ'। ইংরেজীতে একে বলে—hypnotise (হিপ্‌নোটাইজ) বা মন্ত্রমুগ্ধ করা। ব্রাহ্মণেতর জাতগুলির একটু একটু করে চমক ভাঙছে। ব্রাহ্মণদের তন্ত্রে-মন্ত্রে তাদের আস্থা কমে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে ব্রাহ্মণদের সব তুকতাক এখন ভেঙে পড়ছে পদ্মার পাড় ধসে যাবার মতো, দেখতে পাচ্ছিস তো?

শিষ্য : আজ্ঞা হাঁ, আচার-বিচারটা আজকাল ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

স্বামীজী : পড়বে না? ব্রাহ্মণেরা যে ক্রমে ঘোর অনাচার-অত্যাচার আরম্ভ করেছিল! স্বার্থপর হয়ে কেবল নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য কত কি অদ্ভুত, অবৈদিক, অনৈতিক, অযৌক্তিক মত চালিয়েছিল! তার ফলও হাতে-হাতেই পাচ্ছে।

শিষ্য : কি ফল পাইতেছে, মহাশয়?

স্বামীজী : ফলটা কি দেখতে পাচ্ছিস না? তোরা যে ভারতের অপর সাধারণ জাতগুলিকে ঘেন্না করেছিলি, তার জন্যই এখন তাদের হাজার বছরের দাসত্ব করতে হচ্ছে, তাই তোরা এখন বিদেশীর ঘৃণাস্থল ও স্বদেশবাসিগণের উপেক্ষাস্থল হয়ে রয়েছিস।

শিষ্য : কিন্তু মহাশয়, এখনও তো ব্যবস্থাদি ব্রাহ্মণদের মতেই চলিতেছে; গর্ভাধান হইতে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপেই লোকে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপই করিতেছে। তবে আপনি ঐরূপ বলিতেছেন কেন?

স্বামীজী : কোথায় চলছে? শাস্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার কোথায় চলছে? আমি তো ভারতবর্ষটা সব ঘুরে দেখেছি, সর্বত্রই শ্রুতি-স্মৃতি-বিগর্হিত দেশাচারে সমাজ শাসিত হচ্ছে! লোকাচার, দেশাচার ও স্ত্রী-আচার—এই এখন সর্বত্র স্মৃতিশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে! কে কার কথা শুনছে? টাকা দিতে পারলেই ভট্চাযের দল যা-তা বিধি-নিষেধ লিখে দিতে রাজি আছেন! কয়জন ভট্চায বৈদিক কল্পগৃহ্য ও শ্রৌত-সূত্র পড়েছেন? তারপর দেখ—বাংলায় রঘুনন্দনের শাসন, আর একটু এগিয়ে দেখবি মিতাক্ষরার শাসন, আর একদিকে গিয়ে দেখ মনুস্মৃতির শাসন চলছে! তোরা ভাবিস—সর্বত্র বুঝি একমত চলছে! সেইজন্যই আমি চাই—বেদের প্রতি লোকের সম্মান বাড়িয়ে বেদের চর্চা করাতে এবং সর্বত্র বেদের শাসন চালাতে।

শিষ্য : মহাশয়, তাহা কি এখন আর চলা সম্ভবপর?

স্বামীজী : বেদের সকল প্রাচীন নিয়মই চলবে না বটে, কিন্তু সময়োপযোগী বাদ-সাদ দিয়ে নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করে নূতন ছাঁচে গড়ে সমাজকে দিলে চলবে না কেন?

শিষ্য : মহাশয়, আমার ধারণা ছিল—অন্ততঃ মনুর শাসনটা ভারতে সকলেই এখনও মানে।

স্বামীজী : কোথায় মানছে? তোদের নিজেদের দেশে দেখ না—তন্ত্রের বামাচার তোদের হাড়ে হাড়ে ঢুকেছে। এমন কি, আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম—যা মৃত বৌদ্ধধর্মের কঙ্কালাবশিষ্ট—তাতেও ঘোর বামাচার ঢুকেছে। ঐ অবৈদিক বামাচারের প্রভাবটা খর্ব করতে হবে।

শিষ্য : মহাশয়, এ পঙ্কোদ্ধার এখন সম্ভব কি?

স্বামীজী : তুই কি বলছিস, ভীরু কাপুরুষ? অসম্ভব বলে বলে তোরা দেশটা মজালি। মানুষের চেষ্টায় কি না হয়?

শিষ্য : কিন্তু মহাশয়, মনু-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ দেশে পুনরায় না জন্মালে উহা সম্ভবপর মনে হয় না।

স্বামীজী : আরে, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থ চেষ্টার জন্যই তো তাঁরা মনু-যাজ্ঞবল্ক্য হয়েছিলেন, না আর কিছু! চেষ্টা করলে আমরাই যে মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের চেয়ে ঢের বড় হতে পারি! আমাদের মতই বা তখন চলবে না কেন?

শিষ্য : মহাশয়, ইতঃপূর্বে আপনিই তো বলিলেন, প্রাচীন আচারাদি দেশে চালাইতে হইবে। তবে মন্বাদিকে আমাদেরই মতো একজন বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন?

স্বামীজী : কি কথায় কি কথা নিয়ে এলি! তুই আমার কথাই বুঝতে পারছিস না। আমি কেবল বলেছি যে, প্রাচীন বৈদিক আচারগুলি সমাজ ও সময়ের উপযোগী করে নূতন ছাঁচে গড়ে নূতন ভাবে দেশে চালাতে হবে। নয় কি?

শিষ্য : আজ্ঞা হাঁ।

স্বামীজী : তবে ও কি বলছিলি? তোরা শাস্ত্র পড়েছিস, আমার আশা-ভরসা তোরাই। আমার কথাগুলি ঠিক ঠিক বুঝে সেইভাবে কাজে লেগে যা।

শিষ্য : কিন্তু মহাশয়, আমাদের কথা শুনিবে কে? দেশের লোক উহা লইবে কেন?

স্বামীজী : তুই যদি ঠিক ঠিক বোঝাতে পারিস এবং যা বলবি, তা হাতে-নাতে করে দেখাতে পারিস তো অবশ্য নেবে। আর তোতাপাখির মতো যদি কেবল শ্লোকই আওড়াস, বাক্যবাগীশ হয়ে কাপুরুষের মতো কেবল অপরের দোহাই দিস ও কাজে কিছুই না দেখাস, তাহলে তোর কথা কে শুনবে বল্?

শিষ্য : মহাশয়, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে দুই-একটি উপদেশ দিন।

স্বামীজী : উপদেশ তো তোকে ঢের দিলুম; একটি উপদেশও অন্ততঃ কাজে পরিণত কর। জগৎ দেখুক যে, তোর শাস্ত্র পড়া ও আমার কথা শোনা সার্থক হয়েছে। এই যে মন্বাদি শাস্ত্র পড়লি, আরও কত কি পড়লি, বেশ করে ভেবে দেখ—এর মূল ভিত্তি বা উদ্দেশ্য কি। সেই ভিত্তিটা বজায় রেখে সার সার তত্ত্বগুলি ও প্রাচীন ঋষিদের মত সংগ্রহ কর এবং সময়োপযোগী মতসকল তাতে নিবদ্ধ কর; কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিস, যেন সমগ্র ভারতবর্ষের সকল জাতের—সকল সম্প্রদায়েরই ঐ-সকল নিয়ম পালনে যথার্থ কল্যাণ হয়। লেখ দেখি ঐরূপ একখানা স্মৃতি; আমি দেখে সংশোধন করে দেবো'খন।

শিষ্য : মহাশয়, ব্যাপারটি সহজসাধ্য নয়; কিন্তু ঐরূপে স্মৃতি লিখিলেও উহা চলিবে কি?

স্বামীজী : কেন চলবে না? তুই লেখ না। 'কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী'—যদি ঠিক ঠিক লিখিস তো একদিন না একদিন চলবেই। আপনাতে বিশ্বাস রাখ। তোরাই তো পূর্বে বৈদিক ঋষি ছিলি, শুধু শরীর বদলিয়ে এসেছিস বইতো নয়? আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, তোদের ভতর অনন্ত শক্তি রয়েছে! সেই শক্তি জাগা; ওঠ্, ওঠ্, লেগে পড়্, কোমর বাঁধ। কি হবে দু-দিনের ধন-মান নিয়ে? আমার ভাব কি জানিস? আমি মুক্তি-ফুক্তি চাই না। আমার কাজ

শিষ্য : মহাশয়, এত যুবক আপনার নিকট আসিতেছে, ইহাদের ভিতর ঐরূপ স্বভাববিশিষ্ট কাহাকেও কি দেখিতে পাইতেছেন না?

স্বামীজী : যাদের ভাল আধার বলে মনে হয়, তাদের মধ্যে কেউ বা বে করে ফেলেছে, কেউ বা সংসারের মান-যশ-ধন-উপার্জনের চেষ্টায় বিকিয়ে গিয়েছে; কারও বা শরীর অপটু। তারপর বাকি অধিকাংশই উচ্চ ভাব নিতে অক্ষম। তোরা আমার ভাব নিতে সক্ষম বটে, কিন্তু তোরাও তো কার্যক্ষেত্রে সে-সকল এখনো বিকাশ করতে পারছিস না। এই-সব কারণে মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হয়; মনে হয়, দৈব-বিড়ম্বনে শরীরধারণ করে কোন কাজই করে যেতে পারলুম না। অবশ্য এখনও একেবারে হতাশ হইনি, কারণ ঠাকুরের ইচ্ছা হলে এই-সব ছেলেদের ভেতর থেকেই কালে মহা মহা ধর্মবীর বেরুতে পারে—যারা ভবিষ্যতে আমার idea (ভাব) নিয়ে কাজ করবে।

শিষ্য : আমার মনে হয়, আপনার উদার ভাব সকলকেই একদিন না একদিন লইতে হইবে। ঐটি আমার দৃঢ় ধারণা। কারণ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, সকল দিকে সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই আপনার চিন্তাপ্রবাহ ছুটিয়াছে। কি জীবসেবা, কি দেশকল্যাণব্রত, কি ব্রহ্মবিদ্যাচর্চা, কি ব্রহ্মচর্য—সর্বত্রই আপনার ভাব প্রবেশ করিয়া উহাদের ভিতর একটা অভিনবত্ব আনিয়া দিয়াছে! আর দেশের লোকে কেহ বা আপনার নাম প্রকাশ্যে করিয়া, আবার কেহ বা আপনার নামটি গোপন করিয়া নিজেদের নামে আপনার ঐ ভাব ও মতই সকল বিষয়ে গ্রহণ করিতেছে এবং সাধারণে উপদেশ করিতেছে।

স্বামীজী : আমার নাম না করলে তাতে কি আর আসে যায়? আমার idea (ভাব) নিলেই হল। কামকাঞ্চনত্যাগী হয়েও শতকরা নিরানব্বই জন সাধু নাম-যশে বদ্ধ হয়ে পড়ে। Fame, that last infirmity of noble mind[১] (যশের আকাঙ্ক্ষাই মহৎ

১। Lycidas–Milton

ব্যক্তিদের শেষ দুর্বলতা)—পড়েছিস না? একেবারে ফলকামনাশূন্য হয়ে কাজ করে যেতে হবে। ভাল-মন্দ—লোকে দুই তো বলবেই, কিন্তু ideal (উচ্চাদর্শ) সামনে রেখে আমাদের সিঙ্গির মতো কাজ করে যেতে হবে; তাতে 'নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তবন্তু'[১] (পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিন্দা বা স্তুতি যাই করুক)।

শিষ্য : আমাদের পক্ষে এখন কিরূপ আদর্শ গ্রহণ করা উচিত?

স্বামীজী : মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হবে। দেখ না, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল! জীবন-মরণে দৃক্‌পাত নেই—মহা জিতেন্দ্রিয়, মহা বুদ্ধিমান! দাস্যভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠন করতে হবে। ঐরূপ হলেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা-আপনি হয়ে যাবে। দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞাপালন আর ব্রহ্মচর্যরক্ষা—এই হচ্ছে Secret of success (সফল হবার একমাত্র রহস্য); 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' (এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই)। হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব, অন্যদিকে তেমন ত্রিলোকসন্ত্রাসী সিংহবিক্রম! রামের হিতার্থে জীবপনপাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না! রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব-শিবত্ব-লাভে পর্যন্ত উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশপালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। এরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই। খোল-করতাল বাজিয়ে লম্ফঝম্প করে দেশটা উৎসন্নে গেল। একে তো dyspeptic (অজীর্ণ) রোগীর দল, তাতে আবার লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখবি খোল-করতালই বাজছে! ঢাকঢোল দেশে তৈরি হয় না? তূরীভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ-সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল! এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে?

১। নীতিশতকম্, ভর্তৃহরি

কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকতে হার মেনে যায়! ডমরু শিঙা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে, 'মহাবীর, মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত করতে হবে। যে-সব music-এ (গীতবাদ্যে) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে-সব কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল-টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এইরূপ ideal follow (আদর্শ অনুসরণ) করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। তুই যদি একা এভাবে চরিত্র গঠন করতে পারিস, তাহলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐরূপ করতে শিখবে। কিন্তু দেখিস, ideal (আদর্শ) থেকে কখনও যেন একপা-ও হটিসনি। কখনও সাহসহীন হবিনি। খেতে শুতে পরতে, গাইতে বাজাতে, ভোগে রোগে কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। তবে তো মহাশক্তির কৃপা হবে।

শিষ্য : মহাশয়, এক এক সময়ে কেমন হীনসাহস হইয়া পড়ি।

স্বামীজী : তখন এরূপ ভাববি—'আমি কার সন্তান? তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীন বুদ্ধি, হীন সাহস!' হীন বুদ্ধি, হীন সাহসের মাথায় লাথি মেরে 'আমি বীর্যবান, আমি মেধাবান, আমি ব্রহ্মবিৎ, আমি প্রজ্ঞাবান' বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি। 'আমি অমুকের চেলা, কামকাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী'—এইরূপ অভিমান খুব রাখবি। এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান যার নেই, তার ভেতরে ব্রহ্ম জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিসনি? তিনি বলতেন, 'এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী।' এইরূপ অভিমান সর্বদা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে। তাহলে আর হীন বুদ্ধি, হীন ভাব নিকটে আসবে না। কখনও মনে দুর্বলতা আসতে দিবিনি। মহাবীরকে স্মরণ করবি—মহামায়াকে স্মরণ করবি। দেখবি সব দুর্বলতা, সব কাপুরুষতা তখনই চলে যাবে।

লালন
বিভিন্নতার মাঝে অভিন্নতা
বাংলাদেশ
Identity in difference
LALON BANGLADESH